মাষ্টারমশায়

৭৫ ধর্মদাস মিত্র

মাষ্টারমশায়

৯৫

ধর্মদাস মিত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম দে'জ সংস্করণ :
—শ্রাবণ ১৩৯০
—আগষ্ট ১৯৮৩

প্রথম প্রকাশ :
১৫ই আগষ্ট (স্বাধীনতা দিবস)
১৯৪৯ সাল

প্রকাশক :
সুভাষচন্দ্র দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি :
ধীরেন শাসমল

মুদ্রাকর :
সনাতন হাজরা
প্রভাবতী প্রেস
৬৭ শিশির ভাতুড়ী সরণী
কলিকাতা ৭০০০০৬

ছয় টাকা

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত জ্ঞানরঞ্জন সেন

ও

বন্ধুপত্নী শ্রীমলিনা সেন

করকমলেষু

…ছোটদের নৈতিক ও কৃষ্টিগত উন্নতির কাজে আপনাদের আদর্শ আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তাই ছেলেদের জন্য লেখা এই বই আপনাদের হাতে বেমানান হবে না জেনেই আপনাদের নাম বইয়ের প্রথম পাতায় প্রীতি ও আন্তরিকতার সঙ্গে যুক্ত করলাম। ইতি—

প্রীতিমুগ্ধ

আপনাদের

শ্রীধর্মদাস মিত্র

……বড় আশা নিয়ে একদিন দেশের ভবিষ্যৎ আশাস্থল, বাঙ্গলার অগণিত কিশোর ও শিশুদের জন্য কলম ধরেছিলাম, য়্যাডভেঞ্চার ও ভৌতিক কাহিনীর বাজারে তাদের জন্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক গল্প লিখবো ব'লে। আনন্দের সহিত আজ জানাচ্ছি সে আশা আমার ব্যর্থ হয় নি। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা গল্পগুলি সানন্দে গ্রহণ করায় আমি উৎসাহিত ও কৃতার্থ হয়েছি।

য়্যাডভেঞ্চর ও বাস্তব-মূলক কাহিনীর ফাঁকে ফাঁকে দেশের প্রতি ও জাতির প্রতি মমত্ববোধ এবং প্রকৃত মানুষ হবার প্রেরণা কিশোর ও শিশুদের মনে জাগিয়ে তুলবার জন্যই বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত আমার বাছাইকরা কয়েকটি সংস্কৃতিমূলক গল্প নিয়ে 'মাষ্টারমশায়', প্রকাশিত হ'ল। মাষ্টারমশায়ের শুভকামনা ও বাণী যেদিন বাঙ্গালীর ছেলেদের জীবনে বাস্তবরূপে প্রতিফলিত হ'তে দেখবো, সেদিন আমার রচনা হবে সার্থক।

ইতি—

১৫ই আগষ্ট (স্বাধীনতা দিবস)
১৯৪৯ সাল

বিনীত
ধর্মদাস মিত্র

অনুক্রম

আমি যত্ন-পূর্বক 'মাষ্টারমশায়ের' পাণ্ডুলিপি পাঠ করেছি, এর গল্পগুলি শিশু সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাষ্টারমশায়

আমরা তখন জামতাড়া স্কুলের ছাত্র।

জামতাড়া স্কুল তখন সবেমাত্র খোলা হয়েছে। কিন্তু আশেপাশে আর ভাল হাইস্কুল না থাকায় আমাদের স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল অনেক।

বোর্ডিং হাউস ছিল—সাতটা।

অতবড় স্কুলে অত অধিকসংখ্যক ছাত্র নিয়ে কোনও নবাগত হেড্‌মাষ্টারই পেরে উঠছিলেন না।

এমন সময় একাধারে স্কুলের হেডমাষ্টার ও হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট হয়ে এলেন প্রশান্ত সেন বি. এ.; বি. টি.। প্রশস্ত তাঁর বক্ষ, উন্নত তাঁর ললাট, প্রশান্ত তাঁর মুখ। মুখের পানে তাকালেই মাথা নুয়ে পড়ে। বয়স বেশী নয়, বড় জোর তিরিশ।

হোষ্টেলে এসে প্রথমেই তিনি আমাদের সকলকে কাছে ডেকে স্মিতহাস্যে বললেন—আমায় চেন তোমরা?

সমস্বরে বলে উঠলাম—হ্যাঁ, স্যার!

—বেশ, বেশ! আনন্দের সঙ্গে তিনি বললেন, শুনলাম এর আগে তোমাদের স্কুলে কয়েকজন মাষ্টারমশায় এসে কিছুদিন ক'রে থেকেই চলে গেছেন। তাঁদের মতই আমিও আজ তোমাদের শিক্ষিত করবার, তোমাদের মানুষ করবার গুরুদায়িত্ব ভার নিয়ে এখানে এসেছি, হেডমাষ্টারের কাজ করতে। যদি বিফল হই, আমাকেও চলে যেতে হবে, অন্যান্য মাষ্টারমশায়দের মত।

মাষ্টারমশায়ের কথাগুলি স্তব্ধভাবে শুনে যেতে লাগালাম।

তিনি বলে চললেন,—ছাত্রগণ! সংস্কৃতে একটা শ্লোক আছে—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানম্"! তোমাদের সেই সত্য মনে রাখতে হবে ; শিক্ষার প্রথম ধাপ হচ্ছে শ্রদ্ধা ; গুরুজনকে ভক্তি করা, তাদের কথা মেনে চলা। শ্রদ্ধা থেকে আসে discipline বা নিয়মানুবর্তিতা যা' মানুষকে বড় করে, জাতিকে বড় করে।

মাষ্টারমশায় থামলেন। ঢং ঢং করে হোষ্টেলের স্নানের ঘণ্টা পড়ে গেল।

তারপর একে একে তিন চার বছর কেটে গেছে।

স্কুলে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখে অবাক হতে হয়। জামতাড়া স্কুলের সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

মাষ্টারমশায় যতক্ষণ স্কুলে থাকেন ততক্ষণ স্কুলের ছাত্ররা চুপচাপ, সেখানে তিনি শিক্ষক, তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষক।

আবার হোষ্টেলে যখন আসেন, তখন তিনি আমাদের বন্ধু।

পুকুরে স্নান করতে নেবে কারুকে সাঁতার শেখাচ্ছেন, কারুকে হয়ত বলছেন—এসো, দেখি কে আগে সাঁতরে ওপারে যেতে পারে, আমি, না তুমি? রেডি, ওয়ান, টু থ্রি...

কোন দিন বা জ্যোৎস্না-রাতে পড়ার সময়ের পর হোষ্টেলের সানবাঁধানো চত্বরে বসে গল্প হয়,—শিক্ষার গল্প, বিভিন্ন দেশের সংস্কৃতির গল্প, যে-গল্প ছেলেদের বড় হবার প্রেরণা দেয়, সেই রকম গল্প।

মাষ্টারমশায় বলতেন—বিশ্বাস করবে তোমরা ন'বছর বয়স পর্যন্ত আমার অক্ষর পরিচয় হয় নি? আমার জন্মের একমাস আগেই আমার বাবা মারা যান। নিঃস্ব, নিঃসম্বল বিধবার সন্তান আমি। পৃথিবীতে প্রবেশাধিকার পাই, আমার মামাদের আশ্রয়ে। অবশ্য মামাদের গলগ্রহ হ'লেও আমার প্রতি তাঁদের ভালবাসার অভাব ছিল না। বিধবা মায়ের ও মামাদের অত্যধিক

স্নেহ পেয়ে আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে দুঃখিনী মা, আমর মুখের পানে চেয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন।

মা আদর করে নাম রেখেছিলেন প্রশান্ত। কিন্তু তার ঠিক বিপরীতভাবে সমানতালে আমি অশান্ত ও দুরন্ত হয়ে উঠেছিলাম। পাড়া প্রতিবেশী থেকে আরম্ভ করে বাগানের মালী পর্যন্ত বাড়ীতে এসে আমার নামে নালিশ করে মাকে ও মামাদের অতীষ্ঠ করে তুলতো। মা শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলতেন, ওরে! মূর্খ পুত্র আর চোঁয়া দুধে (জ্বলে যাওয়া দুধ) সমান রে ; কোন কাজে লাগে না! তখন সে কথা কানে তুলি নি। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন একটা মুহূর্ত অকস্মাৎ আসে, যখন মানুষ তার ভুল বুঝতে পারে এবং সেই সামান্য উপলক্ষ্য থেকে মানুষের জীবনে হঠাৎ পরিবর্তন এসে যায়।...একদিন জ্যোৎস্নার আলোতে বাইরে বারান্দায় মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি, হঠাৎ গালের ওপর ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে ঘুমটা ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে চেয়ে দেখি জ্যোৎস্নার আলোকে মায়ের চোখে তখনও অশ্রু টলটল করছে।—কেন কাঁদছ মা?—আমি বললাম।

মার মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে গেল—তোর কি হবে, তাই ভেবে! কথাটা সামান্য কিন্তু কেন জানি, আমার মনে একটা আলোড়ন জাগিয়ে দিল ; যেন স্পষ্ট দেখলাম, অদূর ভবিষ্যতে দ্বার হতে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে আমি ফিরছি। কেঁদে ফেললাম আমি, রুদ্ধনিঃশ্বাসে বললাম, মা! আমি পড়াশুনা করবো, ভাল হব।

মা ম্লান হেসে বললেন—বাবা আমি আশীর্বাদ করি তুই মানুষ হ'।

তারপর থেকে আমার সাধনা সুরু হল। আমার দুরন্ত স্বভাব কোন দিকে চলে গেল। শুধু খেলার সময় খেলা ছাড়া আমি মনোযোগ দিয়ে পড়ে যেতে লাগলাম, তারপর কৃতিত্বের সঙ্গে একটির পর একটি পরীক্ষা পাশ করে বাইশ বছর বয়সে বি, এ, পাশ

করলাম। তারপর কলিকাতা থেকে সেই বছরেই বি, টি, পাশ করে ওখানকার স্কুলে ৭ বছর মাষ্টারী করেছি। তারপর এখানকার কথা তোমরা জানো। ছাত্রদের পক্ষে বড় কথা হচ্ছে "ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ"। পড়াশুনা করবে তপস্যা করার মত মন নিয়ে। মানুষ হও তোমরা ; তোমাদের পিতামাতার সঙ্গে দেশও তোমাদের মুখ চেয়ে বসে আছে।

সেদিন ক্লাসে মাষ্টারমশায় ধীরেনবাবু অনুপস্থিত ; সামান্য কারণে অবনীশের সঙ্গে অজিতের মারামারি লেগে গেল।

সে কী ধস্তাধস্তি আর মল্লযুদ্ধ—চীৎকার আর কোলাহল। চেয়ার বেঞ্চি উল্টে পড়তে লাগলো।

ইতিমধ্যে কখন হেডমাষ্টারমশায় এসে পিছনে দাঁড়িয়েছেন তা কেউ টের পায় নি।

বজ্রনির্ঘোষে হেড মাষ্টারমশায় হেঁকে উঠলেন—Both of you stand up on the bench ! দপ্তরী বেত !

দপ্তরী লক্‌লকে বেত নিয়ে এল।

—অবনীশ, এগিয়ে এসো। পাতো হাত।...

সপাং সপ...

অবনীশ আর্তনাদ করে উঠলো।

মাষ্টারমশায় রাগে কাঁপছেন।—অজিত...

অজিত কাঁপতে কাঁপতে আগিয়ে এল—

—হাত পাতো, পাতো হাত বলছি।

দুজনের হাতে রক্ত জমে গেল।

হোষ্টেলে ফিরে সুপারের রুমে তলব পড়লো,—অজিত ও অবনীশের।

অশ্রু-ভরা চোখে অবনীশ ও অজিত গিয়ে দাঁড়ালো।

বয়স তাদের দুজনেরই ১৬।১৭ বছরের মধ্যে। ছেলেমানুষ বই

সে কী ধস্তাধস্তি আর মল্লযুদ্ধ—চীৎকার আর……(পৃঃ ১২)

ত নয়। বেতের আঘাতে হাতের রক্ত তখনও জমে রয়েছে।

মাষ্টারমশায় অবনীশ ও অজিতকে দুই কোলের কাছে টেনে নিলেন।—

—অবনীশ! অজিত!

তাঁর গলার স্বর দেবে এলো, চোখের কোণে অশ্রু টলটল করছে, গলার স্বরটা কাঁপছে—

—ভদ্র হও, সৎ হও তোমরা। তোমাদের শরীরে নির্মমভাবে বেত চালাতে কত ব্যথা পাই, বলে বোঝাবার নয়।

তিনি ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেললেন।

—তোমরা আমার ছাত্র, আমার সন্তানতুল্য! তোমরা যদি এখন থেকে এভাবে discipline নষ্ট কর, তবে কোন দিন প্রকৃত মানুষ হতে পারবে না; আমার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

দু'জনের পিঠে হাত বুলিয়ে তিনি সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

কিছুদিন পরের কথা।

স্কুল-কর্তৃপক্ষের কোনও কাজের প্রতিবাদ জানাতে স্কুলের ছেলেরা ধর্মঘট করলো।

গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পিকেটিং করতে লাগলো।

মাত্র কয়েকজন ছাড়া কোন ছেলেই স্কুলে এলো না।

উন্মত্ত ও ক্রুদ্ধ ছাত্রদের মধ্যে শান্ত ও ধীরভাবে মাষ্টারমশায় এসে দাঁড়ালেন—ছেলেদের উদ্দেশ্য করে বললেন—

মাই বয়েজ! তোমরা স্কুলে এসো; অন্যায় দিয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ অথবা প্রতিকার করা যায় না। তোমরা স্কুলে যোগদান করে তোমাদের অভাব, অভিযোগ আমায় খুলে বল। আমি শিক্ষক, তোমাদের অনুরোধ করছি।

ছাত্রেরা এক-পাও নড়লো না।

হেড মাষ্টারমশায় ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন ছাত্রদের মাঝখান

থেকে ! উন্মত্ত ছাত্রদল স্তব্ধ।

—তবে তোমাদের সঙ্গে এই আমার শেষ ! আজ আমি বুঝতে পেরেছি, আমি তোমাদের শিক্ষক হবার যোগ্য নই ; আমার প্রদর্শিত পথ তোমরা গ্রহণ করবে না !

আফিসের ভেতর গিয়ে অনেকক্ষণ ধরে তিনি কি লিখলেন। সমস্ত ছাত্র ততক্ষণে স্কুলে ঢুকেছে।

মাষ্টারমশায়েরা আগিয়ে এলেন। স্কুলের ছেলেরা এতক্ষণে হতভম্ব হয়ে গেল। ছোট ছেলেরা কাঁদতে সুরু করলো।

মাষ্টারমশায় কোন কথাই বললেন না, তখন তিনি আর শিক্ষক নন ; শিক্ষকের পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি বেরিয়ে এসেছেন।

ছেলেরা হাতে পায়ে ধরে অনুরোধ করল ; মাষ্টারমশায় অটল, অচল। তিনি বললেন—তোমাদের কবি কি বলেছেন জানো—

বিদায় দিয়েছি যারে নয়ন জলে,
এখন ফিরাবো তারে কিসেরি ছলে ?

—যা আমি একবার ফেলে এসেছি, তা গ্রহণ করতে আমি অক্ষম।

ছাত্রগণ তাঁকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে চাইলো।

উদ্গত অশ্রুবেগকে বৃথা চাপতে চেষ্টা করে কাঁপা গলায় তিনি বললেন, প্রিয় ছাত্রগণ ! তোমরা আমায় ক্ষমা করো ; তোমাদের অশ্রুভরা সহস্র চোখের সামনে বিদায়মাল্য নিতে গেলে আমি স্নেহবসে পাগল হয়ে যাবো হয়ত' !

পরদিন দুপুরের গাড়ীতে শ্রীযুক্ত প্রশান্ত সেন কলকাতা চ'লে যাবেন, ছাত্ররা স্কুল কামাই করে তাঁর বাড়ীর সামনে বসে থাকলো। শেষে তাঁর শত অনুরোধ না মেনে এলো ষ্টেশনে। ষ্টেশন-মাষ্টারের অনুমতি নিয়ে ষ্টেশনে ঢুকে তারা প্রণাম করতে লাগলো মাষ্টারমশায়কে।

ট্রেনের পা-দানিতে, কামরার ভিতরে, প্লাটফর্মে শুধু ছাত্রের

দল ভীড় করে মাষ্টারমশায়কে মালা দিচ্ছে আর প্রণাম করছে।

গার্ডের সিটি বেজে উঠলো, সিটি দিয়ে ট্রেন ছাড়লো।

মাষ্টারমশায়ের চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এসেছে তখন ; হাত তুলে তিনি ছাত্রদের বললেন,—

ছাত্রগণ ! তোমরা ভদ্র হও, সৎ হও, প্রকৃত মানুষ হও ; আমি বিদায়ের সময়ে এই শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলাম।

প্রতিশোধ

বছর দশ আগেকার কথা।......

দুর্গম, নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে পাকা রাস্তা তৈরী করবার একটা কণ্ট্রাক্ট পেয়েছিলাম। কণ্ট্রাক্টটা জিলা বোর্ডের কাছ থেকে পাবার জন্য বহু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছিল। সে যেন ঠিকাদারীর এক প্রতিযোগিতা!

কণ্ট্রাক্টটা পাবার পর দেখলাম, কাজটা যত সোজা ভেবেছিলাম, তত সোজা নয়! প্রথম কথা, ঐ বিপদসঙ্কুল অরণ্যে দিনের পর দিন খেটে বন পরিষ্কার করে পথ প্রস্তুত করতে বহু মজুরের আবশ্যক। কিন্তু যেখানে প্রতিমুহূর্তে বিপদ, প্রতিপদে মৃত্যুর সম্ভাবনা, সেখানে অর্থের প্রলোভন দেখিয়েও লোক পাওয়া কষ্টকর। তবু, দায়িত্বভার যখন ঘাড়ে নিয়েছি, তখন শেষরক্ষা করা ছাড়া উপায় কি! তাছাড়া তখন বয়স ছিল অল্প; দুর্লভকে লাভ করবার, দুর্লঙ্ঘ্যকে জয় করবার মত মনের দৃঢ়তা ছিল।

আমাদের সহর থেকে মাইল বারো দূরে ছিল একটা পাহাড়-তলী।

একদিন দুপুরের দিকে কিছু খাবার বেঁধে নিয়ে দ্বিচক্র-যানটিতে চড়ে সেই পাহাড়তলীর দিকে মজুরের সন্ধানে রওনা হ'লাম।

...উঁচুনীচু মাঠের পথ দিয়ে সাবধানে সাইকেল চালিয়ে যখন সেই পাহাড়তলীর নিকটে পৌঁছলাম, পশ্চিমের আকাশকে রঙীন করে সূর্য তখন পাহাড়ের ওপারে অস্ত গেছেন।

ঐ পাহাড়ের ওপার থেকেই সেই নিবিড় অরণ্য, অজানা

বিভীষিকা বুকে নিয়ে, মাইলের পর মাইল জুড়ে সভ্যজগতের অধিবাসীদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনও অসভ্য জঙ্গলীদের পায়ের ধূলো প'ড়েও সে-অরণ্যের মধ্যে একফালি আঁকাবাঁকা হাটা-পথও সৃষ্টি হয়েছে কিনা সন্দেহ।

সেই নিস্তব্ধ গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে, আমায় সৃষ্টি করতে হ'বে পাথর-বাঁধানো পাকা রাস্তা ; যা' পথিক ও যানবাহনের যাত্রা সুগম ক'রবে।

ভাববার সময় নেই ; গোধূলীর রঙ্গীন আকাশের ওপর সন্ধ্যার অন্ধকার-ছায়া ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসছে।

অরণ্য-পথে অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসবার আগেই আমায় পাহাড়তলীর ওই মনুষ্য-বসতিতে পৌঁছতে হ'বে।

গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে মাটির ঘর ও খড়ের চাল নজরে পড়ায় অনেকটা আশ্বস্ত হ'লাম।

যে মনুষ্যজাতির আদিপুরুষ এমনি পাহাড় পর্বত ও অরণ্য-কন্দরে একদিন বিচরণ করে বেড়াতো নির্ভয়ে,—হিংস্র জন্তু জানোয়ারদের সঙ্গে একই সাথে, তা'দেরই বর্তমান বংশধর আমরা। আজ অরণ্যের নিস্তব্ধতা ও নিঃসঙ্গতার মাঝে হাঁপিয়ে উঠি ; অরণ্যের বিভীষিকা গায়ে কাঁটা দেয়···এমনি যুগের পরিবর্তন !

····· পাহাড়তলীর ছোট গ্রামখানিতে পৌঁছে একটা কুঁড়ের সামনে দাঁড়িয়ে সাইকেলের 'বেল' দিলাম।

অনেকগুলি কুঁড়ের ভেতর থেকে উৎসুক জনতা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে বেরিয়ে এলো।

মাত্র কয়েক মাইল দূরের সভ্যজগতের স্পর্শও এদের অনেকে পায় নি ! প্রত্যেকটি মানুষ যেন স্বাস্থ্যের প্রতীক। কালো কুচকুচে রং, মাথায় ঝাঁকড়া চুল ও সরলতায় ভরা উৎসুক চোখ নিয়ে কতকগুলি মাংসপেশীবহুল নরনারী আমার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

তাদের মধ্যে একজন লম্বা, বলিষ্ঠ শরীর, দেখলে বৃদ্ধ ব'লে বোঝা যায় না, শুধু মাথায় সাদাকালো চুলগুলো তার প্রবীণতার সাক্ষ্য দেয়। একটা চোখে তার প্রকাণ্ড একটা গর্ত।

সে আগিয়ে এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় জিজ্ঞেস করল—কী চাই বাবু ?

বললাম, আমি এই বাঘমারীর জঙ্গলের ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরীর ঠিকা পেয়েছি, তাই মজুর খুঁজতে বেরিয়েছি।

—বাঘমারীর জঙ্গলে! অতবড় বলিষ্ঠ-জোয়ানের কণ্ঠস্বর কেমন কেঁপে উঠলো।—দুষমন্ লুকিয়ে আছে বাবু ঐ জঙ্গলে; প্রাণের মায়া থাকতে কেউ একাজে সাহস পাবে না।

তার কথায় মনে মনে অনেকটা হতাশ হলেও এত সহজে আশা ছাড়লাম না। ভাবলাম সুবিধামত কথাটা পাড়বো, তাই বললাম—সে কথা পরে হবে ধীরে সুস্থে; এখন রাতের মত একটু থাকবার জায়গা চাই।

দেখলাম লোকটা জঙ্গলী হলেও হৃদয়হীন নয়। কথায় বার্তায় বোঝা গেল, সহরে কদাচিৎ তার যাতায়াতও আছে। বাঙ্গলা কথা বলতে শিখেছে কিছু কিছু।

লোকটা আমাকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

ছোট মাটির ঘর, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খুপ্রীর (ছোট জানালা বা গবাক্ষ) ওপরে একটা 'লম্ফ' প্রচুর ধূম উদ্গীরণ করে ঘরটিকে সামান্য আলোকিত করেছে। লোকটা আমাকে একটা দড়ির চারপাই (খাটিয়া) পেতে দিল।

তারপর বোধ হয় আমার আহারের সন্ধানেই সে বেরুচ্ছিল, আমি নিষেধ করে জানালাম, আমার সঙ্গে খাবার আছে।

টিফিনকেরিয়ার খুলে খাবার খেতে খেতে কাজের কথা পাড়লাম। ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছিলাম, নাম তার মন্নুয়া! তাই বললাম—আচ্ছা মন্নুয়া! তুমি বাঘমারী জঙ্গলের ভেতর গেছ কোনদিন ?

আবার বলিষ্ঠ মনুয়ার মুখে ভয়ের ছায়া ঘনিয়ে এলো। বলল —সেই কথাই ত বলছিলাম বাবু! দুষমন ঘাপটি মেরে বসে আছে ওই জঙ্গলের ভেতর। মানুষখেকো দুষমন্! একবার ঢুকেছিলুম এই চোখটা গেছে।......

সে বলে চলল—সেদিনকার কথা ভাবতেও আমার গায়ে কাঁটা দেয় বাবু! তখন যোয়ান বয়স, ভয় কাকে বলে সে কথা-ই মনুয়া জানতো না; বাপমায়ের কাছে শুনেছিলাম উ জঙ্গলে বাঘ আছে; হাতী আছে,...এমন কোন জানোয়ার নাই, যা' বাঘমারীর জঙ্গলে নাই! তবু একদিন ভাবলাম পাহাড় পেরিয়ে উপাশে দেখতে হবেক...বাঘমারীর জঙ্গল। একদিন, হাতে একটা টাঙ্গি লিয়ে পাহাড়ের ইপাশের জঙ্গল ঠেলে ঠেলে উপরে উঠতে লাগলাম। তখন ভরা দু'পহর! (গল্পের মত করে তার জীবনের রোমাঞ্চকর সত্য ঘটনা মনুয়া বলে চলল) কাঁটা ঝোপ সরিয়ে সরিয়ে উপরে উঠতে গিয়ে দেখি, একটা বড় গাছে বাকল ঝুলছে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম সেটা বাকল লয়, একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপ! ভয় পেলাম না বাবু; পাহাড়ী আমরা, অত সহজে ভয় পাই না। সাপটাকে কিছু দূরে রেখে পাশ কাটিয়ে আমি পাহাড়ের উপরে উঠে গেলাম। তখন সূয্যি ডুবে গেছে, সন্ধ্যা হয়-হয়। তবু এতটা যখন উঠেছি তখন শেষ দেখে যাবো ভেবে উপাশে নামতে সুরু করলাম। যেদিকেই চাই শুধু ঘন বন—তার মাঝে মাঝে আঁধার কালো হয়ে আসছে। হঠাৎ, কি যেন পিছন থেকে আমার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়লো। ভাববারও সময় পেলাম না; ঘাড়টা ঘুরিয়ে দেখি, প্রকাণ্ড এক দুষমন্ বাঘ, চোখ দিয়ে তার আগুনের ফুলকী ছুটছে যেন। তারপর সে আমার পিঠে বড় বড় থাবা চালাতে লাগল। তার বিষাক্ত ধারাল নখের আঘাতে আমার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল, তবু ধৈর্য হারালাম না। কোন রকমে বাঘটার দিকে মুখ ফিরিয়ে একহাতে কুস্তীর কায়দায় বাঘটাকে আঁকড়ে ধরলাম অপর হাতে চালালাম টাঙ্গি! এক চোটেই জানোয়ারটা জখম

হয়ে ছিটকে পড়লো কিছু দূরে। কিন্তু পরেই ডবল উৎসাহে আমায় আক্রমণ করল। ততক্ষণে অন্ধকারের ভিতর আন্দাজেই আরও ২।৩ বার টাঙ্গি চালিয়েছি। তারপর তাড়াতাড়ি একটা বড় গাছে উঠে বসে থাকলাম, সারা রাত। সকাল হলে দেখি, একটা প্রকাণ্ড বাঘ গাছতলায় রক্তমাখা হয়ে পড়ে আছে। গলায় তার প্রকাণ্ড একটা টাঙ্গির কোপ!

ক্ষতবিক্ষত শরীর নিয়ে ঘরে ফিরে এলাম বাবু। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত বাঘের থাবার জখম-ওলা চোখটাকে বাঁচানো গেল না। বাঘমারীর জঙ্গলের দুরন্ত দুষমন্, আমার চোখের উপর তার পরাক্রমের শেষ স্মৃতি রেখে গেল।...

ম্লান আলোকেও, স্পষ্ট দেখলাম, বলিষ্ঠ মনুয়ার সমস্ত মাংস-পেশীগুলো যেন উত্তেজনায় কাঁপছে ; সুস্থ চোখটা প্রতিহিংসায় জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

এতক্ষণে বললাম—হয়ত একটাই বাগে পেয়ে তোমাকে আক্রমণ করেছিল, কিন্তু আমরা দলে থাকবো অনেক লোক, সঙ্গে থাকবে বন্দুক, ভয় কি মনুয়া। বুদ্ধিমান মানুষ হয়ে আমরা জানোয়ারের ভয় করবো ?

মনুয়া ম্লান হেসে বললো—ভয় কাকে বলে একদিন মনুয়া জানত না বাবু, কিন্তু আজ……

—না, না, তোমার কোনও ভয় নেই, তুমি আমার সঙ্গে থাকবে, তোমাকে করবো কুলীদের সর্দার।

মনুয়া স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো—নিজের জীবনের পরোয়া মনুয়া করে না বাবু, কিন্তু যাদের সর্দার করে আপনি মনুয়াকে নিয়ে যাচ্ছেন, তাদের জন্যেই হয়ত' দরকার হলে আবার ই মনুয়াই জঙ্গলের দুষমনের হাতে প্রাণ দিতে পিছোবে না।

নিজের সফলতার আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম—ঠিক, ঠিক এইত বীরের মত কথা। কাল থেকেই তবে তুমি মজুর সংগ্রহ করতে সুরু করে দাও। প্রথমে জঙ্গলের মাঝে মাঝে গাছ কেটে

পথ পরিষ্কার করতে হবে, তারপর সেখানে পাথর বিছিয়ে বাঁধানো রাস্তা করা হবে।...

...দিন কয়েক পরের কথা।

পাহাড়তলীর বুনো-গাঁ থেকে মাইল পাঁচেক দূরে বাঘমারীর জঙ্গলের একপ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট ছাউনি পড়েছে, তারই মাঝখানে চারিদিকে তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা বড় তাঁবু, এইটিই এই নিবিড় বিপদসঙ্কুল অরণ্যে আমার রাত্রের আত্মরক্ষার স্থান। অপরগুলি মজুরদের থাকবার জন্য খাটানো হয়েছে।

সারাদিন ধরে পথের উপযোগী করে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়, সন্ধ্যার মুখে সকলে তাঁবুতে ফিরি। দেখলাম, মনুয়া খুব কাজের লোক। ঘন গাছের ফাঁকে ফাঁকে প্রত্যেকটি মজুরের কাছে ঘুরে ঘুরে সে কাজ দেখে বেড়ায়। রাত্রে আমারই তাঁবুর একপাশে শুয়ে রাত কাটায়। কিন্তু রাত্রের মধ্যে সে যে কতবার চমকে উঠে, টাঙ্গি হাতে তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে যায়, আমি লক্ষ্য করেছি। একদিন রুষ্ট হয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—রাত্রে অতবার তাঁবুর বাইরে যাও কেন মনুয়া?

মনুয়া বিনীতভাবে বললো—আগেই ত বলেছি বাবু, যাদের সর্দার করে মনুয়াকে এনেছেন, তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য মনুয়া নিজের প্রাণও দিতে পারে।

তথাকথিত অসভ্য এই জঙ্গলীরও যে নিজের জাতির প্রতি মমতা ও কর্তব্যজ্ঞান এত প্রখর, তা দেখে সত্যই মুগ্ধ হ'লাম।

দু'চারদিন পর একদিন গভীর রাত্রে পরিশ্রমের ক্লান্তিতে ঘুমে চোখ বুজিয়ে আসছে, এমন সময় বাইরে এক বীভৎস চীৎকার শুনে চমকে জেগে উঠলাম। কুলীর দল তখন হল্লা করে টিন পিটতে সুরু করেছে। টোটাভরা বন্দুক নিয়ে বাইরে বেরিয়ে দেখলাম, তাঁবু-গুলির চারিদিক ঘিরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে আর তারই ওপাশে একদল হাতী শুঁড় তুলে বিকট চীৎকার করছে।
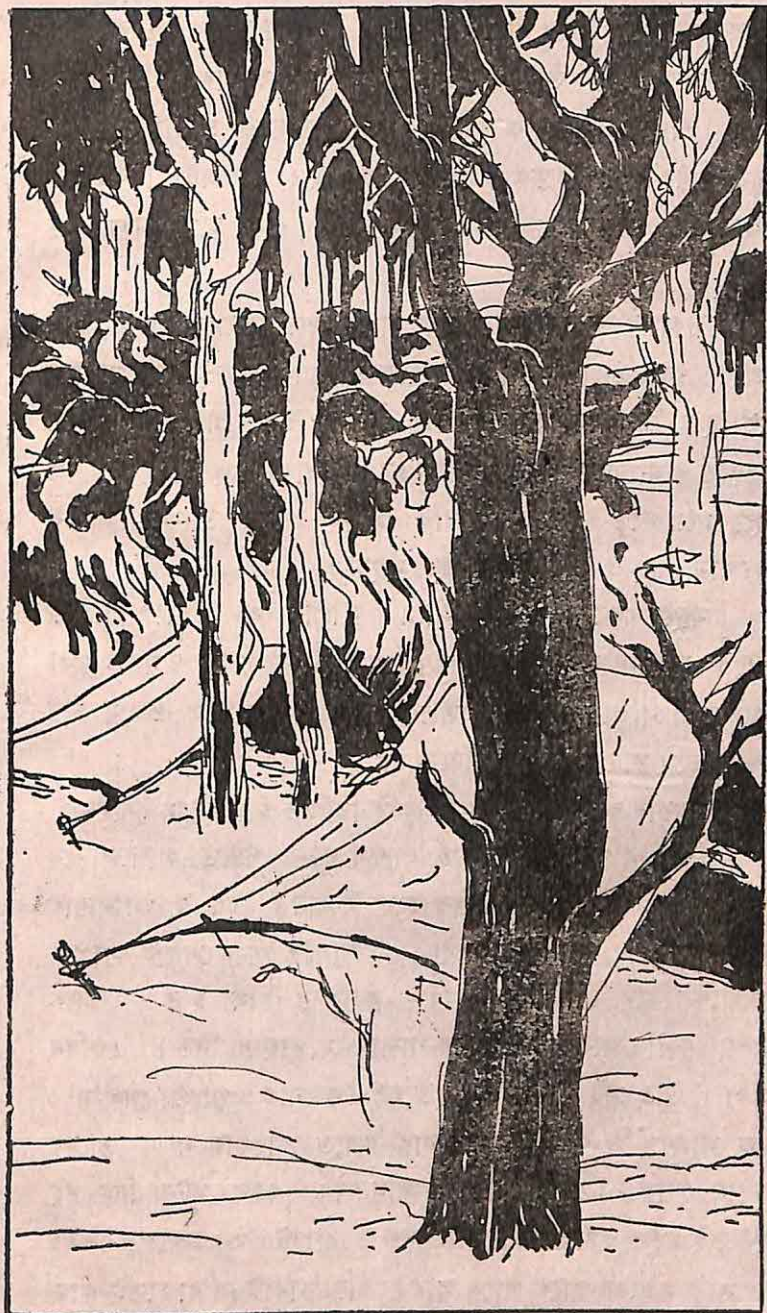
··দাউ দাউ করে আগুন জলছে আর তারই ওপাশে একদল হাতী··

(পৃঃ ২২)

তোমরা বোধ হয় জানো হাতী জঙ্গলের ভেতর দল বেঁধে ছাড়া ঘোরে না। এর নাম হস্তীযূথ। এই হাতীর দল বড় ভয়ঙ্কর। এরা ক্ষেপে উঠলে তাঁবুর এতগুলি লোকের জীবননাশ করতে পারে।

তাড়াতাড়ি বন্দুক তুলে দাঁড়িয়ে সামনের হাতীটাকে লক্ষ্য করে পর পর কয়েকটা গুলি করলাম। প্রথমটা বিকট এক আর্তনাদ, তারপর সেই বিশাল হস্তীযূথ বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সকালে উঠেই দেখি, তাঁবুর কিছু দূরে জঙ্গলের পাশে একটা প্রকাণ্ড কালো পাথরের মত কী পড়ে আছে। বন্দুক হাতে সেখানে পোঁছে যা দেখলাম, তাতে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম। একটা প্রকাণ্ড বুনোহাতী দু'চোখে দুটি এবং মাথার কাছে একটি তীরবিদ্ধ হয়ে মরে পড়ে আছে। মনুয়ার মুখের পানে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—কে এ তীর চালিয়েছিল মনুয়া?

মনুয়া বললে,—বাবু! আমি। আপনি যখন ওপাশে দাঁড়িয়ে বন্দুক চালান তখন আমি দূর থেকে হাতীটার চোখ ও মাথা লক্ষ্য করে তীর চালিয়েছিলাম। হাতীকে ঘায়েল করতে হলে প্রথমে তার ছোট চোখ দুটো কাণা করে দিতে হয়।

মনুয়ার অব্যর্থ লক্ষ্য দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন।

কিছুদিন পরে কিন্তু এমনই আশ্চর্য ঘটনা ঘটতে লাগলো যে আমরা সকলেই ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। বন্য জন্তুজানোয়ার যাতে ক্যাম্পের সীমানার মধ্যে না আসতে পারে সেজন্য ক্যাম্প-গুলিকে ঘিরে চারিদিকে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হ'ত। দুজন সশস্ত্র কুলী অর্ধেক রাত করে পালাক্রমে পাহারা দিত। একদিন সকালে উঠে সেই পাহারাদার দুজনের একজনকেও পাওয়া গেল না। বহু খোঁজাখুঁজি করেও কিছু কিনারা করতে পারলাম না। তাদের গ্রামে লোক পাঠিয়েও খোঁজ পেলাম না। এরূপ ঘটনা দিন দুই ঘটতেই মনুয়া হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেল। সারাটা দিন জঙ্গলের ভেতর প্রত্যেক মজুরের পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়, চারটে না বাজতেই কাজ

বন্ধ করবার জন্য কুলীদের হুকুম দেয়।

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বেই সদলে বাধ্য হয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসি।

তখন জঙ্গলের ভেতর মাইল তিন পথ পরিষ্কার করা হয়েছে।

কাজের এ ক্ষতিতে মনুয়ার ওপর মনে মনে চটে ছিলাম।

একদিন স্পষ্টই বললাম—মনুয়া, এভাবে কাজের ক্ষতি হচ্ছে!

মনুয়া জোর গলায় বললে, কাজ করবার জন্য পয়সা দাও বাবু, জীবনের দাম ত' দাও না। কাজ কম হয়, কম পয়সা দিও, তা' বলে আমার চোখের উপর আমার লোকদের বেঘোরে মরতে দিব না।

কিন্তু মনুয়ার এত সাবধানতা ও সতর্ক পাহারা সত্ত্বেও কোন্ ফাঁকে যে ২।১টি করে কুলী নিখোঁজ হতে লাগলো, বোঝা যাচ্ছিল না।

সেদিন মনুয়া আমার শত বাধা সত্ত্বেও রাত্রে নিজে তাঁবুর পাহারায় নিযুক্ত হল।

হাতে তার চিরসঙ্গী প্রকাণ্ড টাঙ্গিটা আর তীর ধনুক।

অল্পদিনের মধ্যেই এই নির্ভীক হৃদয়বান সহচরটিকে বড় আপন করে নিয়েছিলাম।

হয়ত ভুলে যেতে বসেছিলাম যে, মনুয়া একজন অসভ্য জঙ্গলী, আর আমি সুসভ্য ভদ্রলোক।

মনুয়া বেরিয়ে যেতেই আমি বন্দুকে টোটা ভর্তি করে ক্যাম্পের জানালায় সতর্ক দৃষ্টি রেখে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

চারদিক গভীর থমথমে, নিঝুম, নিস্তব্ধ; শুধু মাঝে মাঝে বাঘমারীর জঙ্গলে শেয়াল ডেকে উঠছে।

শেয়ালের ডাক বন্ধ হতেই ক্যাম্পের আশপাশে একটানা ফেউ ডাকতে সুরু ক'রল।

শুনেছিলাম, বাঘ এলে এমনিভাবে কেউ ডাকে।

আমার ক্যাম্পের চারদিকে ঘন উঁচু তারের বেড়া এবং আমি নিজে সশস্ত্র থাকা সত্ত্বেও আমার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগলো।

বহুক্ষণ এইভাবে কেটে যাওয়ার পর, চারদিকের আগুন স্তিমিত হয়ে উঠেছিল।

কাঠের গাদা থেকে কাঠ নিয়ে নিয়ে মনুয়া চারদিকের আগুনে গুঁজে দিতে লাগলো।

একদল বুনো হাঁস বিচিত্র সুরে ডেকে ডেকে উড়ে চলেছিল। মনুয়া তাড়াতাড়ি তার ধনুকে তীর জুড়ে ছুঁড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে একটা হাঁস তীর বিঁধে ঝটপট করতে করতে ক্যাম্পের পাশে এসে পড়লো।

মনুয়া হাসিমুখে হাঁসটা জানালা দিয়ে আমার হাতে দিয়ে গেল এবং সেই সঙ্গে আমায় শুতে যাবার জন্য অনুরোধ করে গেল।

বন্দুকটা ঠেস দিয়ে রেখে পাশের উনুনটায় হাঁসটা রোষ্ট্ করছি এমন সময় মনুয়ার আর্তনাদ শুনতে পেলাম।

তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেখি, ওপাশ থেকে আগুনের ওপর দিয়ে লাফ দিয়ে, একটা প্রকাণ্ড বাঘ মনুয়ার সামনে এসে পড়লো।

অবাক হয়ে গেলাম—মনুয়ার হাতের সে টাঙ্গি বা তীর-ধনুকটা কই।

হয়ত আগুনে কাঠ দিতে গিয়ে মনের ভুলে নামিয়ে রেখেছিল, এমন সময় এই অতর্কিত আক্রমণ।

আমার ক্যাম্পের ভিতরের বিপদ-সঙ্কেত ঘণ্টা বাজিয়ে দিলাম।

চারদিকে কুলীর দল আর্তনাদ করতে লাগলো।

কিন্তু ক্রুদ্ধ ক্ষুধার্ত বাঘের মুখ থেকে মনুয়াকে রক্ষা করতে

কেউ এগিয়ে গেল না।

আশ্চর্য কিন্তু ঐ বন্য মনুয়ার ক্ষমতা।

সে তার বলিষ্ঠ হাতটার ঘুসির পর ঘুসিতে বাঘটাকে কাবু করে দিল।

তার পরের ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর।

মনুয়া বাঘের দু'পাশের দুটো চোয়ালকে দুহাতে ধরে সজোরে চাড় দিতে লাগলো।

আমি ততক্ষণে বন্দুক হাতে ক্যাম্পের বাইরে বেরিয়েছি। বাঘটা ছটফট করতে করতে দূরে ছিটকে পড়ে স্থির হয়ে গেল।

সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলাম—সাবাস্ মনুয়া! কিন্তু পরমুহূর্তেই অবাক হয়ে দেখলাম, মনুয়াও মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

পাশে গিয়ে দেখলাম মনুয়ার গলদেশে বাঘের নখের আঘাতের গভীর ক্ষত দিয়ে প্রচুর রক্তস্রাব হচ্ছে।

তবু তার মুখে প্রসন্নতার হাসি।

তাড়াতাড়ি ক্যাম্পে গিয়ে ফার্ষ্ট-এডের সরঞ্জাম এনে, ক্ষত স্থানের চিকিৎসায় মন দিতে গেলাম, কিন্তু হায়!

ততক্ষণে মনুয়ার অক্ষত চোখটিতে মৃত্যুর কালো ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

আমার হাতটা চেপে ধরে মনুয়া বললে—প্রতিশোধ বাবু, প্রতিশোধ!

আমার লোকেরা এই বাঘের পেটেই প্রাণ দিয়েছে, আমি ওকে মেরে তার শোধ নিলাম।

পাষাণের তলে তলে যেমন ভাবে স্বচ্ছ স্রোতস্বিনী বয়ে যায়, তেমনি মনুয়ার পাষাণের মত দৃঢ় শরীরের যেখানে একটা কোমল প্রাণ ছিল, বুকে হাত দিয়ে দেখলাম, সেখানকার স্পন্দন থেমে গেছে।

সেই রাত্রে বাঘমারীর বিভীষিকাময় অরণ্য-কন্দরে, বন্ধু-বিয়োগের বেদনায়, আমাদের সকলের চোখগুলি অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছিল।

শম্ভুর বিপত্তি

শম্ভু শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেললো গ্রীষ্মের ছুটিতে সে মামার বাড়ী যাবে।

ছোটকাকা যা কড়া লোক, তাতে এখানে বসে থাকলে এমন ছুটিটা তার মাঠেই মারা যাবে নিশ্চয় !

···কেবল পড়া আর পড়া ; এক একটা মুহূর্ত যেন ছোট-কাকার কাছে এক একটা অমূল্য সম্পদ।

শম্ভু পড়া ছেড়ে একটু বাইরে বেরিয়ে ওবাড়ীর ভূতো কিম্বা ঘোষেদের বাড়ীর নীলুর সঙ্গে একটু মার্বেল খেলতে কি লাটিম ঘোরাতে সুরু ক'রেছে কি অমনি ছোটকাকার ঘর থেকে গুরুগম্ভীর আহ্বান—শম্ভু !

তারপর শম্ভু অপরাধীর মত তাঁর কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, তাঁর কাছ থেকে যে সুমধুর জিনিসটি উপহার পায়, তা তোমরা নাই বা শুনলে !

মামার বাড়ী ; কেমন একটা মধুরতা লুকিয়ে আছে এই নামটার মধ্যে।

মামার বাড়ী সম্বন্ধে সুন্দর ছড়াটা, ছেলেবেলায়, এমন কি এখনও শম্ভুর গড়্‌গড়ে মুখস্থ।

মামার বাড়ী শম্ভু একবার গিয়েছিল, ছেলেবেলায়। সে বোধহয় এক যুগ।

কিন্তু সেই দিন ক'টি, মামাত-ভাই মন্টু ও মাসতুত-ভাই বিমলের সঙ্গে ঘুড়ি ওড়ানো, সর্বোপরি মামীমার রান্না মুড়িঘণ্ট আর

পেঁপের ষ্টুর কথা, আজও শম্ভুর আবছা মনে পড়ে।

ছোটকাকাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে একটা মাস সে ফুর্তি করে আসবে, একদিনও পড়বে না এই দিনগুলির।

মা সরস্বতীর সঙ্গে মনে মনে সে এই ক'টি দিনের জন্য আড়ি ক'রে দিল।

মা আপত্তি করলেন না। বললেন, আহা, অনেকদিন যায় নি, যাক্ ঘুরে আস্থক।

আর তাকে পায় কে! পরদিনই দুপুরের ট্রেনে রওয়ানা।

ছোট কাকা ডেকে পই পই করে পড়াশুনা করতে বলে দিলেন।

মনে মনে হাসি চেপে নিঃশব্দে শম্ভু শুধু ঘাড় দুলিয়ে সম্মতি জানালো।

মামার বাড়ী পৌঁছে, শম্ভু সবে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে কিনা সন্দেহ, ভগবান বাদ সাধলেন।

মোটা মত এক ভদ্রলোক গম্ভীরভাবে এসে জিজ্ঞেস করলেন— শম্ভু, তুই কোন ক্লাসে পড়িস? কি বই পড়া হয়, দিনে ক'ঘন্টা পড়িস এমনি আরও কত কি।

শম্ভু হাঁপিয়ে উঠেছিল ভদ্রলোকের প্রশ্নবাণে।

এমন সময়ে দিদিমা এসে বললেন—কী অবিনাশ! ভাগ্নেকে পড়াশুনার কথা জিজ্ঞেস করছিস বুঝি?

শম্ভু বুঝলো, ইনিই তার পূজনীয় মেজমামা, ক'লকাতার কোন কলেজের বিজ্ঞানের প্রফেসর।

সে তাড়াতাড়ি প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিল। দুবার—থাক্, থাক্ বলেই মামাবাবু বললেন—ক্লাস এইট্? কার সায়েন্স পড়িস? Gregory & Simons, আচ্ছা, আজ সন্ধ্যে বেলা পড়া ধরবো।

শম্ভুর মাথায় যেন বাজ পড়লো।

এখানেও এমন এক জীবন্ত বিপদ লুকিয়ে আছে, এমন জানলে কে আসতো!—

হায়রে অদৃষ্ট!

সন্ধ্যেবেলায় শম্ভু দিদিমা ও মামীমাদের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছিল, যদি কোন রকমে মেজমামাকে এড়ানো যায়।

কিন্তু যথাসময়ে মণ্টুর পড়ার ঘর থেকে মেজমামার কণ্ঠস্বর শোনা গেল,—আনত তোর বইগুলো; শম্ভুকেও ডাক!

বলা বাহুল্য, মণ্টু ও শম্ভু একই ক্লাসে পড়তো।

শম্ভু অপরাধীর মত পাশে এসে দাঁড়ালো।

মেজমামা গম্ভীরভাবে বললেন—ব'স্।

শম্ভু মনে মনে বলল—ছোটকাকার দ্বিতীয় সংস্করণ।

কিছুক্ষণ পড়া ধরেই শম্ভুর শ্রদ্ধাস্পদ মেজমামাটি বুঝতে পারলেন, ভাগ্নের বিদ্যের দৌড়। তার কর্ণাকর্ষণ (মাধ্যাকর্ষণের থেকেও বেগবান) করে ব'ললেন—এই পড়েছিস! ফাঁকিবাজ হচ্ছিস্ এখন থেকে!

পাশেই একটা লণ্ঠন পুরোদমে জ্বলছিল।

পাশের গ্লাস থেকে জল নিয়ে মেজমামা সেটার ওপর ছিটিয়ে ছিলেন, কাঁচটা চড়্‌চড়্ করে ফেটে গেল।

অবাক হয়ে মেজমামার কাণ্ড দেখছিল, এমন সময়ে মামার অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন—কেন ফাটলো, বল?

—আপনি জল ছিটিয়ে দিলেন ব'লে!

—জল না হয় দিলাম, কিন্তু তাতে কাঁচটা ফাটলো কেন; বিজ্ঞানে কি বলে?

শম্ভু ও মণ্টু অবাক হয়ে শুধু তাঁর মুখের পানে তাকিয়ে থাকলো।

মেজমামা বললেন—বোকা বাঁদর! এটুকু সোজা কথাও বলতে পারলি নে!

শম্ভু ও মণ্টু উভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কাঁচকাটার সঙ্গে বোকা বাঁদরের যোগাযোগ খুঁজছিল বোধ হয়, এমন সময় প্রফেসর অবিনাশ বলে চললেন—Expansion অর্থাৎ সম্প্রসারণ। প্রত্যেক জিনিষই গরম হলে বেড়ে ওঠে, অর্থাৎ আকার আয়তনে বৃদ্ধি পায়। বিজ্ঞানে একে বলে···matter expands when heated. (অর্থাৎ পদার্থ মাত্রই গরম করলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।) তারই বিপরীত প্রতিশব্দ এবং বিপরীত গুণ হচ্ছে, Contraction বা সঙ্কোচন। অর্থাৎ ছোট হওয়া। প্রমাণ চাও?···এই দেখ্, এই যে তোর হাতে তারেবাঁধা লোহার বলটা রয়েছে, এটা আমার এই চাবির রিংয়ের ভেতর দিয়ে অনায়াসে পার হচ্ছে।

মামা দেখালেন। তারপর, সেটাকে লণ্ঠনের কাঁচ খুলে আগুনে বেশ করে গরম করলেন এবং সেই রিংটির ভেতর দিয়ে পার করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না।

বললেন—এতে কি বোঝালো?

উভয়ে একযোগে বলে উঠলো, গরমে লোহার বলটা আকারে বেড়েছে!

—ঠিক! মামার মুখে প্রসন্নতার হাসি ফুটে উঠলো।—রেল লাইনের মাঝে মাঝে gap বা ফাঁক থাকে দেখেছিস ত, সেটা শুধু এই জন্যই রাখা হয়; গরমের দিনে রৌদ্রের উত্তাপে এবং ট্রেনের চাকার ঘসায় যখন লাইনের আকার বৃদ্ধি হয়, তখন এই gap বা ফাঁকগুলি কমে যায়; এগুলি না থাকলে লাইন বেঁকে যেতো, বুঝলি?

উভয়েই ঘাড় নাড়ল যে তারা বুঝেছে।

—কিন্তু লণ্ঠনের কাঁচ ফাটা?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে কথাও ভুলি নি আমি, ঐ কাঁচ ফাটাও ঐ expansion (সম্প্রসারণ) contraction (সঙ্কোচন)-এর জন্যই। সেইজন্যই ও কথাগুলো তোদের আগে বোঝালাম।—আলোর উত্তাপে কাঁচটা আকারে বেড়েছে এটা ত ঠিক, কেমন? হঠাৎ আমি কয়েক ফোঁটা জল ছিটিয়ে দিলাম; যে জায়গায় জলের

ছিটে লাগল, হঠাৎ সেই জায়গাটুকু সঙ্কুচিত হয়ে গেল। কিন্তু কাঁচের অন্যান্য অংশ তখনও বেড়েই রয়েছে; তার ওপর কাঁচ জিনিষটা খুবই ঠুন্‌কো, সেই জন্যই হঠাৎ এক জায়গায় চাড় পড়ায় কাঁচটা ফেটে গেল, এই হল এর কারণ।

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রৌদ্রে বাইরে তখন অনল বর্ষিত হচ্ছে। রৌদ্রে পথে বের হয় কার সাধ্য! চারদিক যেন ঝাঁ ঝাঁ করছে।

ঘরের চারদিকের দরজা জানালা বন্ধ করে দিয়ে মণ্টু ও শম্ভু একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও পড়া মুখস্থ করছে। কারণ সম্মুখে জীবন্ত বিভীষিকার মত মেজমামা চেয়ার জাঁকিয়ে বসে আছেন।

গা বেয়ে তাদের কল্ কল্ করে ঘাম ঝরছে, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে; তবু তারা প্রাণপণে চীৎকার করে চলেছে—"একটা জিনিষ উপর হইতে যে মাটির দিকে পড়ে, তাহার কারণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বা attraction. প্রত্যেক পদার্থকে পৃথিবী সবলে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। গাছ হইতে ফল মাটিতে পড়িতে দেখিয়া বৈজ্ঞানিক নিউটনের মনে প্রথমে এ বিষয়ে যে খট্‌কা লাগে, তাহারই ফলে গবেষণার দ্বারা বর্তমান মাধ্যাকর্ষণ বা Law of Gravitation of the earth এর আবিষ্কার।"

এমন সময় নির্জন নিস্তব্ধ পথে বিচিত্র স্বরে বরফওয়ালা হেঁকে উঠলো—বরোফ! ব-র-ও-য়্-ফ!

মেজ মামা চেয়ারে বসেই লাফিয়ে উঠলেন—ডাক, বরফ-ওয়ালাকে ডাক!

মণ্টু ও শম্ভু কয়েক মুহূর্ত পড়া কামাইয়ের ও সেই সঙ্গে বরফ খাওয়ার আনন্দ উপলব্ধি করেই বোধ হয় এক সাথে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল।

মামা বরফওয়ালাকে ডেকে এক পয়সার বরফ কিনলেন।

…তারপর তাদের উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন— (পৃঃ ৩৫)

তারপর, তাদের উভয়কে উদ্দেশ্য করে বললেন—বরফ দেখছিস্ ?

উভয়েই জানালো যে, তারা ভালভাবেই দেখছে।—জানিস এর temparature বা তাপ কত ?

উভয়েই চুপ।

—শূন্য অর্থাৎ '০' ফারেনহাইট। থার্ম্মোমিটার বা তাপমাপক যন্ত্রটির নামকরণ হয়েছে ফারেনহাইট থার্ম্মোমিটার।

গ্লাসের জলটাতে মেজমামা বরফের টুকরোটি ফেলে দিলেন।

মণ্টু ও শম্ভু বরফজল পানের আনন্দে আশান্বিত ও পুলকিত হয়ে উঠেছিল।

মামা কিন্তু তাদের নিরাশ করে বরফজলের গ্লাসটা হাতে নিয়েই বসে থাকলেন।

তারপর হুকুম করলেন—মণ্টু যা আমার ঘর থেকে ফারেনহাইট থার্ম্মোমিটার নিয়ে আয়!

থার্ম্মোমিটার এলো। মামা সেটাকে বরফজলটায় ডুবিয়ে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে, বরফজলটির তাপ, '০' ডিগ্রী ফারেনহাইট।—যতক্ষণ এতে একটুকরোও বরফ থাকবে, মামা বলে চললেন—ততক্ষণ এর তাপ থাকবে '০' ডিগ্রী, কিন্তু শেষ টুকরোটি গলে যাওয়া মাত্রই জলটি তার সাধারণ তাপ প্রাপ্ত হবে।

তাঁর প্রমাণ শেষ করে মামা জলটুকু বাইরে ফেলে দিলেন। তারপর বললেন—তেমনি জল ২১২° ডিগ্রী ফারেনহাইট উত্তপ্ত হলেই ফুটতে থাকে এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যায়; সে প্রমাণ কালই দেখাবো।

শম্ভু কিন্তু পরদিন, দিদিমা ও মামীমাদের শত অনুরোধ সত্ত্বেও কিছুতেই সেখানে থাকতে রাজী হলো না।

সে স্পষ্টই জানিয়ে দিল যে, ছোটকাকার জন্য তার বড্ড মন

কেমন করছে।

মামাবাড়ীর সকলে এমন কি মেজমামাও যে শম্ভুর পিতৃব্য-প্রীতি ও গুরুজনের প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন, একথা বলাই বাহুল্য!!

দুর্যোগের রাত্রে

গভীর রাত্রে বাইরে থেকে কে যেন আমায় ডাকলো।

বিছানায় ধড়্মড় করে উঠে বসলাম, মনে হ'ল স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু এ কণ্ঠস্বর ত' ভুল হবার নয়।

শ্রদ্ধায় ভালবাসায় ভরা সে কণ্ঠস্বর বিস্মৃত হ'তে পারি না।

কিন্তু এই দুর্যোগের গভীর রাত্রে অসুস্থ শরীরে কোন্ ট্রেনে সে আসবে !

তবু আলোটা জ্বালবার পর্যন্ত সময় হল না ; দরজাটা খুলে দিলাম।

বাইরে গভীর অন্ধকারের মাঝে বৃষ্টির একটানা ঝম্‌ঝম্ শব্দ, কড়্ কড়্ শব্দে মেঘ ডাকছে, জলের ঝাপটায় শোঁ শোঁ শব্দে কানে তালা ধরে।

দরজা খুলে কিন্তু কারুকেই দেখতে পেলাম না।

মনে হ'ল আমার মনের ভুল।

কয়েকদিন আগে আমি তাকে অসুস্থ দেখে এসেছি, আজ এ ঘটনা স্বপ্নই হ'ক বা মনের ভুলই হ'ক, আমার ভাল মনে হ'ল না।

এলোমেলো কত কি ভাবছি ; এমন সময় মনে হ'ল আমার কাছে আমার খুবই কাছে তার কণ্ঠস্বর।

কাকুমণি।

চম্‌কে ডাকলাম—কে ?

উত্তর এলো—আমায় চিনতে পারছ না কাকুমণি ? আমি···

—হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিচয় দিতে হবে না, পাকা-বুড়ীর মত কোথা থেকে ডাকছিস্ তাই বল্। পেছনের দরজায়? দাঁড়া আলোটা জ্বালি।

একটা চাপা হাসির শব্দ, তারপর অনুরোধের সুরে—না না কাকুমণি, লক্ষ্মীটি, আলো জ্বেল না; আমি ত' আলোতে থাকতে পারবো না; আমি তোমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছি।

সাংঘাতিকভাবে আতঙ্কে চম্‌কে উঠলাম।

—আমার কাছে দাঁড়িয়ে আছিস। তোর অসুখ কি সেরে গেছে রাণী? কাঁপা গলায় বললাম।

—একেবারে সেরে গেছে কাকুমণি, আর কোনও দিন আমার অসুখ হবে না; তোমরা আমার জন্য কত ভাবছিলে বলতো, আর ভাবতে হবে না তোমাদের।

আমি তার কথা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি! অনেক দূর থেকে, অনেক, অনেক দূর থেকে ক্ষীণকণ্ঠে সে যেন বার বার আমায় ডেকে ডেকে উঠছে।

কাকু! কাকুমণি।

—না, নারে পাগলি, না; অমন ক'রে তোকে আমি লুকিয়ে থাকতে দেব না; আলো আমি জ্বালবোই।

আমি পাগলের মত বকে যেতে লাগলাম।

তাকের উপর দেশলাইয়ের বাক্সটা নিজের থেকেই খড় খড় শব্দ ক'রে উঠলো।

সেটা আর খুঁজে পেলাম না।

কোথায় কোন দূরে কড়্ কড়্ শব্দে বাজ পড়'লো। তার শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতেই সে বলে চ'লল—সে কি যন্ত্রণা তোমায় কি বলবো কাকুমণি, মনে হ'ত এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভাল; তারপর কাকুমণি, একদিন সব যন্ত্রণার অবসান হ'ল।......

আমি আর শুনতে পারছি না।

সইয়ের কাজ সেরে বললাম, কিসের টেলিগ্রাম—দাও। (পৃঃ ৪০)

মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভয়ে, বিস্ময়ে ঝিম্ ঝিম্ করছে।

বুক ঠেলে কান্না আসছে—ওরে থাম্, পাগলি থাম্, আর আমি শুনতে পারি না!

—তবে যাই কাকুমণি, যাই!……

আমি কিছু বলবার আগেই দূরে আবার বাজ পড়'ল।

বাইরে সাইকেলের বেল্ (ঘণ্টা) বাজছে। এই দুর্যোগের রাত্রে আবার কে ডাকে?

বাইরে বেরিয়ে দেখি, লাল সাইকেল আর খাকির পোষাকে টেলিগ্রাম পিওন।

আবছা আলোয় কয়েকটা বাঁকা লাইন দিয়ে সইয়ের কাজ সেরে ব'ললাম—কিসের টেলিগ্রাম; দাও!

দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেশলাইটা পায়ে ঠেকলো।

তাড়াতাড়ি আলো জ্বেলে টেলিগ্রামখানা পড়ে, চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল; ঝাপ্‌সা চোখে পড়'লাম—"Rani expired last evening. Dada" ("রাণী কাল রাত্রে মারা গেছে"—দাদা।)

বুকটা চেপে ব'সে পড়'লাম। এইমাত্র যে আমার সঙ্গে কথা কয়ে গেল, সে কে? আত্মা! দেহের বাইরে এসেও কি তবে স্নেহ, ভালবাসা বিস্মৃত হয় না!

আমার স্নেহময়ী ভ্রাতুষ্পুত্রীর সেই কণ্ঠস্বর আজ যেন আকাশে বাতাসে শুধু ডেকে ফিরছে—কাকুমণি! কাকুমণি!

নলডাঙ্গার বোর্ডিং

তখন বয়স আমার তোমাদেরই মত।

নলডাঙ্গার গ্রাম্য-স্কুলে পড়তাম আর স্কুলের সংলগ্ন খোড়ো বোর্ডিংটিতে বাস করতাম,—রেসিডেন্ট্-ষ্টুডেন্ট হিসেবে। কারণ, বাড়ী ছিল স্কুল থেকে বেশ দূরেই।

সেবার খুব শীত পড়েছিল নলডাঙ্গায়।

বাৎসরিক পরীক্ষা তখন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে, আমরা রাত জেগে পড়ি।

কিন্তু সেদিন রাত্রে, ঘরে ঘরে আলো নিবে গেছে তখন, অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ বেখাপ্পা সুরে বোর্ডিংয়ের ঘন্টাটা বেজে উঠলো ঢং ঢং ঢং ঢং।

শব্দ শুনে যে যা'র বিছানায় আতঙ্কে লাফিয়ে উঠেছি।

খড়ের-চালের বোর্ডিং, আগুন লাগে নি ত'? অথবা আর কোনও বিপদই বা ঘট্‌লো!

চারদিকে তাকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ি। কয়েকটা রুম্ পেরিয়েই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের রুম।

বাইরে দেখি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অবিনাশবাবু ঘন্টাটা হাতে নিয়ে তখনও বাজাচ্ছেন ঢং ঢং শব্দে।

বোর্ডিংয়ের যত ছেলে ছুটে এল, ব্যাপার কী জানতে। কৌতূহলের কাছে পৌষের শীতকেও হার মানতে হ'লো!

অবিনাশবাবু অমায়িক ভদ্রলোক। নলডাঙ্গার স্কুলের এবং

গ্রামের ছেলেবুড়ো তাঁকে যথেষ্টই শ্রদ্ধা করতো। তিনি মিষ্টি-হাসি হেসে, আমাদের দিকে তাকিয়ে ব'ললেন—"মাই বয়েজ! (বালকগণ!) এত রাত্রে নিতান্ত দায়ে পড়েই তোমাদের বিরক্ত করেছি, তোমরা আমায় ক্ষমা করো। আমি জানি তোমরা আমার ডাকে সাড়া দেবে, সে সদিচ্ছা ও সৎবুদ্ধি তোমাদের আছে। তাই তোমাদের ডেকেছি। পঞ্চু বাগ্‌দীকে তোমরা নিশ্চয় জানো? যে গ্রীষ্মের দিনে যথা-নিয়মে প্রত্যহ দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ইস্কুলে পাখা টানতো, আজ বৈকালে হঠাৎ কলেরা হ'য়ে সে মারা গেছে! তার একমাত্র সম্বল ছোটছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে খবর দিতে এসেছিল আমাকে।

বেলা তিনটের সময় সে মারা গেছে। অর্থ ও লোকজনের অভাবে এখনও সৎকার হয় নি। কলেরা সংক্রামক রোগ; সেইজন্য আত্মীয় প্রতিবেশী কেউ মড়া নিয়ে যেতে রাজী নয়। অন্য জাতেরা বাগ্‌দীর মড়া ছোঁবেন না।"

অবিনাশবাবুর কথা শেষ হ'তে, সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

টাইফয়েড, নিউমোনিয়া এমন কি যক্ষ্মা-রোগীর পর্যন্ত সৎকার করে এসেছি, কিন্তু কলেরার মড়া এই প্রথম।

সংক্রামক রোগ! যে রোগে সামান্য কয়েকবার দাস্ত বমিই মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঢলিয়ে দেয়। বুকটা একবার কেঁপে উঠলো।

অবিনাশবাবু বললেন—"মাই ব্রেভ্ বয়েজ! Come and follow me!

"—আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে; একা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভবপর হ'লে আমি একাই যেতাম; তোমাদের কষ্ট দিতাম না।"

অবিনাশবাবুর শান্ত ধীর মুখের পানে তাকালাম।

বুঝতে দেরী হ'লো না, কেন লোকে তাঁকে এত ভালবাসে।

বুঝলাম, মানুষের অন্তরেই দেবতার বাস।

আমরা সদলে তাঁর সঙ্গে অগ্রসর হ'লাম।

পঞ্চাননের ঘরের ভেতর হ'তে সেই দারুণ শীতে কম্পমান অবস্থায় যখন আমরা তার মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে দেবতার উদ্দেশ্যে প্রথম 'হরি বোল' বলে মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করলাম, তখন সত্যই আমরা যেন একটা সাম্রাজ্য জয় করেছি।

মাইল দুই দূরে নদী। তারই তীরে গ্রামের শ্মশান।

সমস্ত পথটা নির্জন।

লোকমুখে শোনা যায়, ওই পথে নাকি অশান্ত প্রেতাত্মারা রাত্রের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায়।

ডাকাতও নাকি মাঝে মাঝে শবযাত্রীদের আক্রমণ করে জামা-কাপড় ও জিনিষপত্র কেড়ে নেয়।

আমরা এর আগে দু'একবার রাত্রে ঐ শ্মশানে মড়া পোড়াতে গেছি।

পথে দু'একটা অদ্ভুত দৃশ্যও চোখে পড়েছে।

কিন্তু আমাদের একত্রিত শক্তির কাছে সহজে যে কেউ ঘেঁসতে সাহস করবে না এটুকু বিশ্বাস ছিল।

সেদিন তিথিটা কি ছিল জানি না।

কিন্তু পথটা গভীর অন্ধকারে ঢাকা। তার ওপর কন্‌কনে শীত।

আমাদের আলোগুলোও যেন ঝিমিয়ে পড়েছিল।

পোয়া খানেক পথ গিয়েছি কি না, এমন সময় পেছনে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে কে যেন বলে উঠলো—দাঁড়াও!

পথের ধারে একটা ঝাঁকড়া-বটগাছ, অসংখ্য ডালপালা ঝুলিয়ে গভীর অন্ধকারকে গাঢ় করে তুলেছিল।

মনে হ'লো শব্দটা যেন সেখান থেকেই এসেছে।

হাতের লাঠিগুলো বাগিয়ে ধ'রে স্থির হ'য়ে দাঁড়ালাম।

···তারা মৃতের পদধূলি নিয়ে—ডুকরে কেঁদে··· (পৃঃ ৪৫)

অন্ধকারের মাঝখান থেকে কয়েকটা মূর্তি বেরিয়ে এল।

—কে যায়?

কাঁপা গলায় জবাব দিলাম—নলডাঙ্গার-বোর্ডিং।

আবার প্রশ্ন হ'লো—কা'র মড়া?

—পঞ্চু বাগ্‌দীর!

—পঞ্চু বাগ্‌দী! সবক'টা মূর্তির স্বর কেমন যেন তীব্রভাবে কেঁপে উঠলো—সর্দার!

আমরা ভাবলাম ডাকাতরা তা'দের সর্দারকে ডাকছে। তাই আতঙ্কে একবার শিউরে উঠলাম।

আমরা দলে মাত্র ক'জন কিশোর আর বৃদ্ধ অবিনাশবাবু; কিন্তু ও দলে ছিল অনেক লোক।

হঠাৎ তারা আমাদের সেলাম ঠুকে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বললে—একবার আমাদের সর্দারের মুখখানা দেখতে দেবেন বাবুরা?

শুনে আমাদের বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইল না। ভাবলাম—একি! পঞ্চানন কি তবে ডাকাতদের সর্দার ছিল!

অথচ তার ঘরে একটা জিনিষ নেই; এমন কি তার সঞ্চয় একটা পয়সাও নেই।—আহার জুটতো না তার সবদিন। কারণ কি?

মনটা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

মৃতদেহ নামিয়ে তাদের দেখালাম।

তারা মৃতের পদধূলি নিয়ে—ডুকরে কেঁদে উঠলো।

হাউ হাউ করে বলতে লাগল—বড় ভাল লোক ছিল বাবু,—আমাদের সর্দার। লুটে পুটে নিয়ে আসতো বটে, কিন্তু নিজে কখনো খেত না। সে পয়সায়—নলডাঙ্গায় কেন, দেশে আজ একটিও ভিখিরী নাই জানেন বাবু!···দেশের সকল দুঃখীর অভাব ও একলা মেটাতো!

কথাটা শুনে সত্যই চিন্তায় পড়লাম।

অন্যের অর্থ অপহরণ করে এনে দান করার মধ্যে কী মহত্ব আছে, আজও ভেবে উঠতে পারি নি। কিন্তু, পঞ্চাননের প্রতি শ্রদ্ধায় মনটা আমাদের ভরে উঠেছিল সেদিন।

কয়লা খনির বিভীষিকা

ঝরিয়ার খনি অঞ্চলের উঁচু-নীচু জমির মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে আছে এক একটা চানক।

কোথাও বিরাট গর্ত সৃষ্টি ক'রে খাদ ধ্বসে গেছে, সেই সত্তর আশি ফিট্ গর্তের নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়।

চানকের পাশে পাশে দু'একটা চিম্‌নি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে। চানকের চাকা ঘুরছে, সেইসঙ্গে "ডুলি" খাদের ভেতর পিট্ (লিফ্‌ট নামবার কূপের নাম) দিয়ে ওঠা নামা করছে,—কখনও মানুষ নিয়ে, কখনও কয়লার গাড়ী নিয়ে।

খাদের ওপরটা দেখে অন্ধকার পাতালপুরীর মধ্যে কি বিরাট ব্যাপার চ'লছে কল্পনা করা যায় না।

···কয়লা খাদ তিন রকমের ঃ পিট্ দিয়ে ডুলি যোগে যে খাদে নামতে হয়, তাকে 'ডুলি-খাদ' বলে ; এই রকম খাদে মাটির বহু নীচ-স্তরে মাইলের পর মাইল জুড়ে কয়লা কাটাই হয়।

আর দুরকম খাদ আছে, যার নাম যথাক্রমে 'সিঁড়ি-খাদ' (inclined mines) আর পুকুর-খাদ (dug-out mines)।

এই দু'রকমের খাদে, কয়লা মাটির ওপরের স্তরেই পাওয়া যায় এবং কয়লা অল্পপরিসর স্থানের মধ্যেই থাকে।

সে কথা থাক, সাধারণ একটি কলিয়ারী বা কয়লা খাদের ডুলি যোগে 'পিট্' বেয়ে আমরা খাদের ভেতর নেমে যাই। ডুলি যেখানে গিয়ে থামে, তার চারপাশে অন্ধকার প্রাচীর আর অন্ধকার সুড়ঙ্গ।

মাঝে মাঝে দু'একটা আলো জ্বলছে; ছপ্ ছপ্ ক'রে কয়লার গা বেয়ে জল ঝরছে, সেই শব্দকে রাত্রে ভৌতিক কাণ্ড বলে ভ্রম হওয়া বিচিত্র নয়।

চারদিকে এই রকম নিবিড় অন্ধকারের মাঝখানে 'টিবরীর' (লম্ফ) আলো, যৎসামান্যই আলোক দেয়!

এই সুড়ঙ্গের দু'পাশে কয়লার কালিতে বীভৎস আকার মালকাটারা 'টিবরী' পাশে রেখে গাঁইতির সাহায্যে কয়লা কেটে ট্রলিগাড়ী বোঝাই করছে। Gassy mines, বা খাদের ভেতর বিস্ফোরক বাষ্পের অস্তিত্ব আছে, সেখানে 'টিবরী' নিয়ে যাওয়া নিষেধ। সেই শ্রেণীর খাদের ভেতর ইলেকট্রিক আলো এবং 'Davy's safety lamp'নামক এক প্রকার বিশেষ আলো ব্যবহার করা হয়। সুড়ঙ্গের মাঝে মাঝে কয়লার 'পিলার' বা থাম; বাড়ীর ছাদ যেমন থামের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি ভাবে ওপরের মাটি আর কয়লার স্তরকে ছাদের আকারে রেখে মাইলের পর মাইল জুড়ে এই পাতাল-গহ্বরের ভেতর কয়লাকাটারা কয়লা কাটছে। তাদের ওপর কুলীসর্দারের সতর্ক দৃষ্টি। একটু কাজে গাফিলতি দেখলে অমনি হুমকি দেয়। কপালের ঘাম মুছে ফেলে মালকাটারা বিরামহীন ভাবে কয়লার স্তরের ওপর গাঁইতি চালিয়ে চলে।

যারা কোনদিন খাদের নীচে নামে নি, তাদের জন্য এটুকু তথ্য সংগ্রহ ক'রে আমরা ডুলি চড়ে ওপরে উঠতে থাকি। দু'পাশে কয়লার দেওয়ালের পাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে চানকের দড়ির টানে ডুলি ওপরে উঠে এলো; সেই সঙ্গে আমাদের ডুলিটার পাশ দিয়ে আর একটা ডুলি খাদের নীচে নেমে গেল।

খাদের ওপর স্তূপীকৃত কয়লার কিছু দূরে, সার সার কুলীদের বস্তী, একে 'কুলীধাওড়া' বলে। কয়লার কালিতে কালো রং আর কালো পোষাকের মালকাটার দল। এই পায়রার খোপের মত ছোট

ছোট ঘরগুলিতে পুত্র-পরিবার নিয়ে নিঃশঙ্কচিত্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে।

খাদের সিটিতে ডিউটি বদলের সময় ঘোষিত হলেই তারা গাঁইতি আর ঝোড়া ঘাড়ে 'হাজরি' লিখিয়ে ডুলির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়; এবং একে একে নেবে যায়—পাতালপুরীর গহ্বরে। তারপর আটটি ঘণ্টা হাড়ভাঙ্গা কয়লাকাটার খাটুনির পর উঠে আসে তাদের এই বাসগৃহগুলিতে এবং সামান্য যা' জোটে তাই খেয়ে ঝোড়া কিম্বা গাঁইতিটাকে বালিশ করে ঘুমিয়ে পড়ে—নিঃসাড়, নিঝুম।

কোনও বৈচিত্র্য নেই, কোনও নূতনত্ব নেই তাদের জীবনে।

কয়লার অন্ধকার স্তরের মাঝে, দিনের পর দিন কাটিয়ে তাদের মনটাও ক্রমশঃ আলোর স্পর্শ হারিয়ে ফেলে। খনির নীচে বিপদ যে কোন্ সময় অতর্কিতে আসবে, মৃত্যু যে কখন হঠাৎ হাতছানি দেবে, সে সংবাদও তারা রাখতে পারে না। এইখানেই আমাদের গল্পের আরম্ভ—

খাদের ডিউটি বদলের সিটি বেজে উঠেছে; আলস্য ছেড়ে বুধ্না উঠে ব'সল দড়ির খাটিয়াটার ওপর। দুবার হাই তুলে গাঁইতি আর ঝুড়িটা নিতে যাবে, এমন সময় পেছন থেকে তার ছোট্ট মেয়ে ডুংনি ডেকে ওঠে—'বাপু! আমি একটা পয়সা লিব।' বুধ্না হঠাৎ মেয়েটাকে ধম্‌কে ওঠে; স্নেহের কাঙ্গাল মা-মরা মেয়ে, একটুতেই চোখে তার জল আসে। তার ছল্ ছল্ চোখের পানে তাকিয়ে বুধ্নার পিতৃহৃদয়ের অন্তঃস্তলে বোধহয় ঘা লাগে, তাই তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলে—'এখন ত নাই রে, হাজরি থেকে ফিরে দিব!' সঙ্গে সঙ্গে তার কুকুরটা হঠাৎ কেমন বীভৎস ভাবে অকারণে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে।

'হাজরি'র দেরী হয়ে যায় দেখে গাঁইতি ঘাড়ে নিয়ে, ঝোড়াটাকে তাতে ঝুলিয়ে কেরোসিনের টিবরীটা হাতে নিয়ে বুধ্না খাদের দিকে এগিয়ে যায়।

ছোট্ট ঘরটিতে ব'সে হাজারিবাবু তাদের নামের পাশে পাশে উপস্থিত, অনুপস্থিতির বিশেষ চিহ্ন বসিয়ে দেন। তারপর ওপরের লিফ্‌টম্যান্ একটা ঘণ্টা বাজাতেই বুধ্‌না এবং আরও জনকয়েক মালকাটাকে নিয়ে ডুলি খাদের অতল গহ্বরে নেবে যেতে থাকে।

হঠাৎ একজন মালকাটা বিরাট শব্দে হেঁকে ওঠে।

পাতাল গহ্বরের সঞ্চিত কয়লা মানুষের ও কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য বহু পরিশ্রম ও অর্থব্যয়ে ওপরে তোলা হয়। মালকাটারা গাড়ীর পর গাড়ী কয়লা বোঝাই করে লিফ্‌টের সাহায্যে ওপরে তুলে দিচ্ছে।

কয়লার গাড়ীটা বোঝাই করে দিয়ে বুধ্‌না একবার ক্লান্তিতে হাই তোলে।

মানুষের শরীর আর মন ত; এই অন্ধকার পাতাল গহ্বরের মধ্যে কতক্ষণ থাকতে ইচ্ছে হয়! ওপরে উঠবার জন্য তার মনটা কেমন আনচান করতে থাকে।

চারদিকে ছপ্ ছপ্ শব্দে অবিরাম জল পড়ছে, গায়ে মাথায় সে জলের ছিটে লাগছে।

বুধ্‌না ছুটির সিটি শুনবার জন্য উৎসুক আগ্রহে কান পেতে থাকে।

আটটা ঘণ্টা পেরুলেই সে যেন এই অন্ধকার কারাগারের ভেতর হতে মুক্তি পায়।

তখন খাদের 'পিলার' কাটাইয়ের সময়।

এক একটা গাঁইতি কয়লার থামের উপর মারতে, কঠিনপ্রাণ মালকাটাদের মনেও আতঙ্ক জাগে, কখন কয়লার স্তর মাথার ওপর ধসে পড়বে এই আশঙ্কায়।

আর কতকগুলো কয়লা বোঝাই হলেই গাড়ীটা ভর্তি হয়, ততক্ষণে নিশ্চয় ছুটির সিটি বেজে যাবে।

বুধ্‌না জোরে জোরে কয়লার স্তরের ওপর গাঁইতি চালাতে থাকে।

·· সমস্ত শরীর থেঁৎলে গেছে। শরীরে হাড়গুলো বোধহয়···(পৃঃ ৫২)

ক্ষণিকের জন্যে সে হয়ত ভুলেও গিয়েছিল যে পিলার কাটাই হচ্ছে, একটু অসাবধানতা মানে মৃত্যু !

হঠাৎ একটা ভীষণ শব্দ হয়। পাশাপাশি যত মালকাটারা ছুটতে থাকে ডুলিতে উঠে পড়বার জন্য।—'খাদ ধসছে, খাদ ধসছে—।'

এই আর্তনাদ শুনে বুধ্না কেমন যেন হতভম্ব হয়ে যায়। তারই কাটা 'পিলার' ধসে পড়ছে !

একটা মুহূর্ত, বুধ্না ক্লান্ত বাহু দুটি বাড়িয়ে ঝুড়িখানা তুলবার চেষ্টা করে।

ততক্ষণে কয়লা আর মাটির ছাদ তার মাথার ওপর ধসে পড়েছে।

একটা করুণ বীভৎস আর্তনাদ সেই পাতালপুরীর গহ্বরে, দেওয়ালে-দেওয়ালে প্রতিধ্বনি তুলে মিলিয়ে যায়।

খাদের ওপরের জমিতে বিরাট গর্তের সৃষ্টি করে—যেখানে ধস নেমে গেছে, কয়েকদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর সেই ধ্বংসস্তূপের ভিতর থেকে কয়েকটি পচা দুর্গন্ধময় বিকৃত মৃতদেহ বের করা হয়।

কী বীভৎস সে দৃশ্য !

মুখ দেখে চিনবার জো নেই। সমস্ত শরীর থেৎলে গেছে, শরীরের হাড়গুলোও বোধহয় গিয়েছে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে।

বুধ্নার অবুঝ ছোট্ট মেয়ে ডুংনির আর্তনাদমুখর কণ্ঠ থেকে যে পরিচয়—তার হাতের 'উলকি' আর বুকের এক চিহ্ন থেকে পাওয়া যায় তাতে বোঝা গেল, বুধ্না কয়লার স্তূপের নিচে প্রাণ দিয়েছে।

হাজরির খাতায় তার নামের ওপর লাল কালির দাগ টেনে লেখা হয়—'দুর্ঘটনায় মৃত্যু'।

এই বীভৎস নরকের পাতালপুরে, কত যে লোক বছরের পর বছর ধরে প্রাণ দেয়, তার ইয়ত্তা নেই।

ডুংনির মত কত অসহায় নিরীহ শিশু যে ইহজন্মের মত তার মা অথবা বাবাকে হারিয়েছে,—তা' বলে শেষ করা যায় না।

যদি কোনদিন কয়লার খনি দেখতে আস, তবে একটু কান পেতে শুনো—শুনতে পাবে ডুংনির মত কত মেয়ে তার বাপকে হারিয়ে আকাশে বাতাসে হাহাকার তুলে কাঁদছে—সে কান্নার শেষ নেই।

গল্প নয়

আমাদের বিশু ওরফে বিশ্বনাথ, একটা গল্প আজ লিখবেই। তার জন্যে সে সকালবেলা থেকেই কোমর বেঁধে (অবশ্য, মনের কোমর বেঁধে) লেগে প'ড়েছে।

টেবিলের সামনে ব'সে একবার সে আকাশের দিকে তাকালো।

কলমের ডগা মুখে দিয়ে আপন মনে বিড় বিড়্ ক'রে কি যেন ব'ললো।

উদাসভাবে তাকালো একবার চারদিকে।

অর্থাৎ গল্প-লেখকের যে সমস্ত লক্ষণ, সবগুলিই সে নিজের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা ক'রলো।

তারপর কলমটা কালিতে ডুবিয়ে কাগজের ওপর বসালো।

কিন্তু কলম আর চলে না।

প্রথমে সে ভাবলে—তাইত' কী লেখা যাবে। গল্প ?···গল্প ত' আবার বহু রকমের আছে—এই ধর'—হাসির গল্প, শিক্ষার গল্প, য়্যাড্ভেঞ্চার, ভৌতিক, করুণ,—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—ঠিক, করুণ গল্পই সে লিখবে।

পড়তে পড়তে পাঠকের চোখ দিয়ে জল ঝরবে, মনে হ'বে—আহা, কী হতভাগ্য এরা ; ভগবানের রাজত্বে এত দুঃখীও আছে !

—একটা পয়সা দিন বাবু, দু'দিন কিছু খাইনি।

লেখার মাঝখানে এ বাধা, বিশ্বনাথ বরদাস্ত করতে পারলো না।

···খেতে পাসনি তো আমি তার কি জানি। যা, শিগগির বেরিয়ে···

(পৃঃ ৫৬)

চীৎকার করে উঠলো—ছিঃ, ছিঃ, সবেমাত্র তার চিন্তাধারা দানা বাঁধতে আরম্ভ ক'রেছে, এ সময়ে দরজার সামনে,—স্কাউণ্ড্রেল। ইডিয়ট! খেতে পাস্‌নি ত' আমি তার কি জানি। যা, শীগ্‌গির বেরিয়ে যা বলছি!

ক্লান্ত চোখ মেলে ছেলেটা বিশ্বনাথের মুখের পানে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো কিছুক্ষণ।

—কী, যাবিনে?···ভজুয়া! ইস্‌কা কান পাকাড়কে বাহার নিকাল দেও!

আর একটিও কথা না ব'লে শীতের সকালে ছেঁড়া জামাটায় শীত নিবারণের বৃথা চেষ্টা ক'রতে ক'রতে ক্ষুধার্ত ছেলেটা পথে নেমে গেল।

জনস্রোতের মাঝখানে, যেখানে ধনী, দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও পর্যাপ্ত-আহারী একসাথে চ'লেছে।

বিশ্বনাথ আবার এসে তা'র চেয়ারটিতে বসলো। ছিন্নভিন্ন চিন্তাসূত্রকে জোড়া লাগাবার জন্য সে আবার উদাসভাবে জানালার বাইরে তাকালো।

রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ঠেলা-গাড়ীতে ক'রে একটা স্ত্রীলোক, একটা পঙ্গু অন্ধকে টেনে নিয়ে চলেছে এবং কান্নার সুরে বিনিয়ে বিনিয়ে পথিকদের কাছে এবং পথিপার্শ্বস্থ গৃহস্থদের কাছে ভিক্ষে চাইছে।

কী করুণ সে আবেদন!

কী মর্মান্তিক সে দৃশ্য!

এ জগতকে,—তার সৌন্দর্যকে যারা প্রাণ খুলে দেখছে, তা'রা বুঝবে না অন্ধের বেদনা; অন্ধত্বের কারাগারে—অন্ধকারের রাজত্বে বন্দীদের প্রাণের আকুল কাকুতি তা'রা উপলব্ধি ক'রতে পারে না।

তার ওপর লোকটা খোঁড়া!···কত লোক চ'লে গেল, দেখেও দেখলে না, শুনেও শুনলে না সে আবেদন!

লোকটার কোলের ওপরে একটা ছেঁড়া নেকড়া বিছানো ; তার ওপর মাত্র গোটা-কয়েক পয়সা।

বিশ্বনাথের জানালার পাশে এসে লোকটা হাত পাতলো, মেয়েটি কান্নায় আবেদন জানালো।

নবীন গল্পলেখক বিশ্বনাথের মুখ দিয়ে বেরুলো—Nonsense ! এদের জ্বালায় কী আর মনস্থির ক'রে লেখা যায় !

সে লোকটার মুখের ওপরই সশব্দে জানলাটা বন্ধ করে দিল।

আবার কয়েক মিনিট চিন্তা করে কাটলো। এমন সময় বন্ধ দরজাটা গেল খুলে।

শিশুপুত্র কোলে ঘরে ঢুকলো একটি স্ত্রীলোক।

কোলের ছেলেটাকে একটা ছেঁড়া নেকড়ায় জড়িয়ে এনেছে। মেয়েটা বোধ হয় মা, সন্তানকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য অভাগিনী জননী ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে।

—বাবু ! ছেলেটির আমার বড্ড ব্যেমো !

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে ঢাকাটা খুলে ছেলেটিকে বের করলে। মাস দেড়েক বয়সের একটা কঙ্কালসার পাণ্ডুর প্রাণ, শীতের বাতাসে থর্ থর্ ক'রে কাঁপছে।

এ দৃশ্য বিশ্বনাথ সহ্য করতে পারলো না।

চোখ ঢেকে সে চীৎকার ক'রে উঠলো—বেরিয়ে যাও ! বেরিয়ে যাও আমার চোখের সামনে থেকে।

—বাবু, দয়া করুন, আমার ছেলেটির মুখ চেয়ে দয়া করুন। মেয়েটির দু'চোখে অশ্রুর বন্যা নেমে এলো।

—দূর হও ! বিশ্বনাথ গর্জন ক'রে উঠলো। কাজের সময় বাধা দিলে তা'র মাথার ঠিক থাকে না ; বিশেষ ক'রে সে যখন জটিল গল্প লেখায় হাত দিয়েছে।

চারদিকের দরজা জানলা ভালভাবে বন্ধ ক'রে, বিশ্বনাথ আবার এসে ব'সলো।

ঘড়িতে তখন বারটা বাজছে। কিন্তু, সে প্লট্ খুঁজে পাচ্ছিল না, যা' দিয়ে একটা করুণ গল্প লেখা চলে। যা' পড়ে পাঠক বলবে—আহা বেচারী !

তার কানের কাছে সেই ক্ষুধার্ত ছেলেটা, সেই খোঁড়া লোকটা ও সেই রুগ্ন সন্তানের জননীর আকুল আবেদনই যেন বার বার প্রতিধ্বনি তুলে ফিরতে লাগলো—দয়া কর ! দয়া কর !

কলম ছেড়ে বিশ্বনাথ উঠে পড়লো।

তা'র করুণ-গল্প আজও অসমাপ্ত পড়ে আছে হয়ত' করুণতর প্লটের অভাবেই !!

একজোড়া জুতো

ছোট দুটি পায়েরএক জোড়া জুতো। আগেকার বাজারে কতই বা দাম ছিল তার, বড় জোর দু'টাকা। কিন্তু আজকাল সব জিনিষই চড়া দামে বিকোচ্ছে, জুতোওয়ালা তাই দাম চেয়ে বসলো দশ টাকা।

এইটুকু একজোড়া জুতোর দাম দশ টাকা! গুরুদাসবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন।

এমনিই দাম হয়েছে আজকাল সব জিনিষের। বুঝছেনই ত' স্যার! জুতোওয়ালা বিনীতভাবে জবাব দিল।

শুধু গুরুদাসবাবু কেন সকলেই আজ মর্মে মর্মে বুঝছে কী দুর্মূল্য হয়েছে বাজারে জিনিষপত্র। কিন্তু বুঝলেও উপায় নেই। মধ্যবিত্ত পরিবারের কাছে দশ টাকার মূল্য নয়; দশ টাকায় দশ দিনের বাজার খরচ চলে যাবে। তাই দশ টাকা দিয়ে তাঁর দশ বছরের মেয়ে ঘোতনের একজোড়া জুতো কিনে দিতে পারলেন না তিনি। ইচ্ছে করে দিলেন না তা নয়, সামর্থ্যে কুলালো না। অক্ষম পিতার মর্মবেদনা মানুষ না বুঝুক, যাঁর দৃষ্টিতে জগতের কোনও কিছুই এড়িয়ে যায় না, তিনি বুঝলেন।

—না, অত দাম দিয়ে জুতো নেবো না!

—না বাবা, ঐ জুতো জোড়া আমি নেবো বাবা! কাঁদতে লাগলো ঘোতন! কচি মেয়ে বুঝবে কি করে বাবা-মা তার কত অক্ষম। একটি মেয়ের দাবী পূরণেও তাঁরা অপারগ!

—তাই নিন স্যার, মেয়ে যখন কাঁদছে, আট আনা দাম না

···তাই দিন স্যার, মেয়ে যখন কাঁদছে; আট আনা দাম···　　(পৃঃ ৫৯)

হয় কমই দেবেন।

তবু কেনা হলো না।

জুতোওয়ালা জুতোর মোট মাথায় নিয়ে বাড়ী বাড়ী জুতো ফিরি করে বেড়াতে লাগলো। আর ঘোতন কাঁদতে লাগলো ফুলে ফুলে। অবুঝ মেয়ে প্রবোধ মানলো না কিছুতেই। সমস্ত রাত বাবা-মার সঙ্গে কথা বললো না, খেলোও না কিছু।

রাত্রিতে কখন যে মেয়ের জ্বর এসেছে তার মাও জানেন না গুরুদাসবাবুও জানেন না। সকালে তিনি যথানিয়মে অফিসে বেরুলেন। দুপুরে যখন বাসায় খেতে এলেন ঘোতনের তখন জ্বর বেশ বেড়েছে। কেরাণী জীবনে ভাববিলাসের, স্নেহের বন্ধনে জড়িয়ে থাকার অবসর কোথায়! তা ছাড়া ম্যালেরিয়া জ্বর ত এদিকে হচ্ছে হামেশাই, গুরুদাসবাবু মনকে প্রবোধ দিয়ে অফিসে বেরুলেন আবার। ফিরলেন সেই সন্ধ্যা ৬৷৷ টায়। মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলেন তিনি। গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। চুপচাপ করে বিছানায় পড়ে আছে ঘোতন। গুরুদাসবাবু বুঝলেন রাগ এখনো পড়েনি মেয়ের। তার ওপর জ্বরটাও বেশ চেপে এসেছে। ওষুধের ব্যবস্থা করে নিশ্চিন্ত হলেন তিনি।

জ্বর কিন্তু পরদিন সকালেও কমলো না। একভাবে ১০৫° ডিগ্রীই চলতে লাগল। চোখ দু'টি রাঙ্গা জবার মত লাল। স্থির হ'য়ে চুপচাপ একভাবে পড়ে আছে ঘোতন। মাথায় আইস ব্যাগ ধরে মা বসে থাকলেন। অন্তর যেন হাহাকার ক'রে উঠলো, কেন কিনে দিলেন না জুতোজোড়া, তাই কি? মনের মাঝে সংশয় ঘনিয়ে এলো—ভগবান্! আশঙ্কায়, ভয়ে মায়ের চোখ বুজে এল।

দুপুরে ডাক্তার এসে বলে গেলেন, সাধারণ ম্যালেরিয়া নয়, মেলিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া, রোগীকে নড়ানো চড়ানো বা ডিস্টার্ব করা চলবে না।

ওষুধ, গ্লুকোজ-মেশানো জল কিছুই গলা দিয়ে পেরুলো না। কচি মুখখানাতেও দু'টি আয়ত চোখ ছাপিয়ে জল আসতে লাগলো

বার বার। সমস্ত শরীরটা কিসের যেন যন্ত্রণায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো।

মা তখনও বোঝেননি ঘোতন তাঁর চলে যাবে।

দশ টাকা দাম দিয়ে মেয়ের একজোড়া জুতো কিনতে অক্ষম হতভাগ্য পিতা কিছু চেষ্টার ত্রুটি করলেন না।

সহর থেকে ডাক্তার নিয়ে এলেন, কিনে আনলেন দামী দামী ওষুধ।

তবু সন্ধ্যের দিকে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়ে এলো। দুটি চোখ মেলে কাকে যেন খুঁজতে লাগলো ঘোতন। সমস্ত শরীরখানা শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্রুততায় দুলতে লাগল।

কারও আর বুঝতে বাকী থাকলো না আর চেষ্টা করা বৃথা।

গুরুদাসবাবু ও তাঁর স্ত্রীকে আর প্রবোধ দেওয়া গেল না কিছুতেই, তাঁরা কাঁদতে লাগলেন, জুতো কিনে দিতে না পারার অনুশোচনায় ধিক্কার দিতে লাগলেন নিজেদের।

ডাক্তার এসে তাঁদের বিছানা থেকে সরিয়ে দিলেন।

যে মরে যাচ্ছে তাকে শান্তিতে মরতে দেওয়াই নাকি ডাক্তারদের রীতি।

একটা মরফিয়া ইন্‌জেকসন দিলেন তিনি।

ধীরে ধীরে সমস্ত যন্ত্রণার যেন উপশম হলো, সমস্ত জ্বালা ও দাহ যেন শীতলতার মাঝখানে জুড়িয়ে গেল।

কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল ঘোতন।

একবার হতভাগ্য পিতামাতাকে বলেও গেল না—আমি জুতোর জন্য রাগ করিনি, নিয়তির ডাক এসেছে তাই তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি।

তারই কয়েকদিন পরে ৺পুজো এসেছে, পথ দিয়ে চলেছে ছেলেমেয়েদের দল নূতন নূতন জামা জুতো পরে। তাদের জুতোর মস্ মস্ খট্ খট্ শব্দ শুনতে পাওয়া যায়।

কচি কচি পায়ের জয়যাত্রা জনপথ মুখরিত করে। তার মাঝে

অতি সাধের নূতন জুতো পরা পরিচিত ছোট পা দু'খানি নেই, কোথায় হারিয়ে গেছে কোন অসীমের মাঝখানে, কে জানে !

ঘোতনের যন্ত্রণাকাতর মুখখানা গুরুদাসবাবু ভুলতে পারেননি আজও।

মনে পড়ছে তার পায়ের মানানসই দুটি ছোট জুতো।

কে যেন এসে ডাকলো—পুজো দেখতে যাবেন না ?

চমকে উঠে বললেন গুরুদাসবাবু—কিসের পুজো ?

ভয়কে এরা জয় করেছে

নিঝুম নিশুতি রাত। জনহীন পথ ও প্রান্তর। কোথাও প্রাণের স্পন্দন নেই যেন। পৃথিবীও যেন ঘুমিয়ে গেছে মানুষের সঙ্গে। নীল উন্মুক্ত আকাশের বুকে খণ্ড খণ্ড মেঘ, তার মাঝখানে লুকোচুরি খেলতে খেলতে যেন পাহারা দিচ্ছে চাঁদ।

ক'াকে পাহারা দিচ্ছে? কার গতিবিধি লক্ষ্য করছে মাথার ওপর থেকে?

জনহীন প্রান্তর আর মেঠোপথ অতিক্রম ক'রে সতর্ক বিপ্লবী দ্রুতপদে চলেছে।—চাঁদটাকে যদি ঘণ্টা খানেকের জন্য মেঘ দিয়ে ঢেকে ফেলা যেত!···না, চাঁদ, তার নাগালের বাইরে, তাই চাঁদ যখনই মেঘের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসছিল, তখনই বিপ্লবীর গতি হয়ে আসছিল ধীর, মন্থর। তার সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টি রাত্রের আলো-আঁধারী ভেদ ক'রে চারিদিকে আশে পাশে ঘুরছিল। মাঝে মাঝে গাছের আড়ালে ছায়ার অন্ধকারে সে আত্মগোপন করছিল। বলা ত যায় না কিছুই, কেউ হয়ত তার অজান্তে পিছু নিতে পারে; পুলিশের সন্ধানী দৃষ্টি এড়িয়ে তাকে দ্রুত গন্তব্যস্থানে পৌছতে হবে, পৌছে দিতে হবে নেতার নির্দেশনামা বীরেনদার হাতে।

···কে এই বীরেনদা, কি তাঁর প্রকৃত পরিচয়, সমরের তা জানবার উপায় নেই, জানতে চাওয়াও নিষেধ আছে। শুধু সমর জানে, বীরেনদা একজন অক্লান্ত কর্মী, বিপ্লবী!

অন্যমনস্কতার মাঝখানে সমর হঠাৎ চমকে উঠলো, পাশের

ঝোপটা একটু দুলে উঠেছে খড়্ খড়্ শব্দ ক'রে। সমরের দুটি চোখ শিকারী বেড়ালের মত জ্বলে উঠলো। দৃষ্টি হ'য়ে উঠলো তীক্ষ্ণ, বুকের ভিতর হাতুড়ীর ঘা পড়ছে যেন।—নাঃ, স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলো সমর।—তেমন কিছুই নয়।—আশঙ্কায় তার রোমাঞ্চ উপস্থিত হয়ে ছিল। ঝোপের পাশে একটা চকচকে কালো খরিস্ সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে।

—যা, যা, ঘুমো গিয়ে গর্তের ভেতর, ভয় নেই। আস্তে আস্তে কথা ক'টি উচ্চারণ ক'রে সমর পথ চলতে লাগলো।

—আচ্ছা জ্বালিয়েছে ত। চাঁদ আবার আড়াল থেকে আত্মপ্রকাশ করেছে, আবছা জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হ'য়ে উঠেছে চারদিক। এদিকে আশেপাশে কোথাও গাছ নেই যে তার আড়ালে একটুক্ষণ আত্মগোপন করা যায়। দ্রুতপদে মাঠ ভেঙ্গে হেঁটে চলা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

এমনি আর একটি দিনের কথাও মনে জাগছে সমরের। নিতান্ত ছেলেবেলার একটি দিনের ঘটনা। তবু সে ছবিটি আজও মনে আঁকা হ'য়ে গেছে যেন।

ছেলেবেলায় পাঠশালার গোপাল-মাস্টারকে যমের মতন ভয় করত সমর, স্কুলে যেতে চাইতো না কিছুতেই। মা হাত ধ'রে নিয়ে গিয়ে পাঠশালায় বসিয়ে দিয়ে আসতেন, বলে আসতেন গোপাল-মাস্টারকে—দেখত বাবা গোপাল, খোকা পালায় না যেন, ওর ওপর একটু নজর রেখো!

গোপাল-মাস্টারের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে প্রায়ই সে পালাত পাঠশালা থেকে। এম্‌নি করেই ভয়ে ভয়ে পথে প্রান্তরে বড়ো পুকুরে পাশের বাগানে লুকিয়ে বেড়াতো। ধরাও যে মাঝে মাঝে প'ড়ত না তা নয়। তার জন্যে গোপাল-মাষ্টার কি মারটাই না মারতেন!

তবু সে দিনকার সেই লুকোচুরির সঙ্গে আজকের এই অভিযানের কত প্রভেদ!

তখন ধরা পড়লে মার খেতে হ'তো, আর আজ ধরা পড়া মানেই মৃত্যু।

পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দিতে হবে, নয়ত' ফাঁসীর মঞ্চে আত্মবলি দিতে হবে।

—আত্মবলি ! দেশের জন্যে আত্মবলি ! ভাবতে গিয়ে তরুণ বিপ্লবী সমরের মনে পুলক জাগে।

একটি কিশোর বয়স্ক বিপ্লবীর হাসিমাখা মুখচ্ছবি মনে পড়ে।

এই মেদিনীপুর জেলার একটি কিশোর, ক্ষুদিরাম বসু !

অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে চলতে অজান্তে সে একটি গ্রামের পাশে এসে প'ড়েছে।

খেয়াল ছিল না তার। কয়েকটি কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দে সে হঠাৎ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো।

তখনকার দিনে মেদিনীপুর জেলার কোন গ্রামই বিপ্লবীদের কাছে নিরাপদ ছিল না।

বিপ্লবীর সন্ধান করতে দিয়ে পুলিশবাহিনী নিরীহ নরনারীর ওপর অবাধে অত্যাচার নির্যাতন চালাতে দ্বিধা করেনি তখনকার দিনে !

একটা ধানের ক্ষেতের উঁচু আলের নীচে চট্ ক'রে লুকিয়ে পড়লো সমর, কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ ক'রে কিছুক্ষণ চীৎকার ক'রে হতাশ হ'য়ে ফিরে গেল।

না, পথ ভুল হয়ে গেছে তা'র।

পকেটে হাত ঢুকিয়ে অকারণে সে রিভলবারটা চেপে ধরলো।

পকেটে তার গুলিভর্তি রিভলবার থাকতে কে তাকে জীবন্ত অবস্থায় বন্দী করতে পারে ? কে ছিনিয়ে নিতে পারে তার নেতার নির্দেশনামা তার বুকের ভিতর থেকে !

কী নির্দেশ সে ব'য়ে নিয়ে চলেছে তা সে জানে না। শুধু

ঝোপের পাশে একটা চকচকে কালো খরিস সাপের ফণা… (পৃঃ ৬৫)

তার ওপর আদেশ আছে—"রাত্রি দেড়টার পূর্বে যে কোনও প্রকারে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এই নির্দেশনামা তোমাকে বীরেনদার হাতে পৌঁছে দিতে হবে ক্যাম্প নম্বর ৪২-এ, সেই জঙ্গলের পাশের পোড়ো বাড়ীতে !"

বিনাবাক্যব্যয়ে একমুহূর্তও বিলম্ব না ক'রে সে বেরিয়ে যথাসম্ভব দ্রুত পা চালিয়ে এসেছে, সতর্কতা অবলম্বন করতে এতটুকু বিলম্ব হয়েছে তার, তার বেশী একদণ্ডও সে নষ্ট করে নি, তবু এখন বারোটা বেজে চল্লিশ মিনিট, ঘড়িটা যেন অত্যন্ত দ্রুত-তালে চ'লেছে আজ !

একবার ভালভাবে চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে সমর দিক্-নির্ণয় ক'রে নিলে, তারপর তার দুটি পা যেন ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার মতন অতি দ্রুত চলতে লাগলো।

এবার আর পৌঁছতে বিলম্ব হ'লো না তা'র !

বীরেনদা যেন অধীর আগ্রহে তার আগমনের প্রত্যাশাই করছিলেন।

জনমানবহীন প্রান্তরের শেষে জঙ্গলের ধারে একটি পোড়ো বাড়ী। দৈন্যের শেষ সীমায় পৌঁচেছে—তারই ভিতর একটি ঘরের এককোণে একটি মোমবাতি মিট্ মিট্ ক'রে জ্বলছে।

বীরেনদার প্রসারিত হাতে সমর খামে বন্ধ চিঠিখানা দিল। সমরের হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে তিনি হর্ষপ্রকাশ করলেন, মুখে কোনও কথাই বললেন না।

কিন্তু বীরেনদার মতন একজন একনিষ্ঠ বিপ্লবীর স্পর্শটুকুই যেন সমরের চরমতম পুরস্কার বলে মনে হ'ল।

বলিষ্ঠ হাতের ঝাঁকুনির ব্যথাটুকুই যেন তার বড় ভাল লাগলো।

যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক সেনাপতির সঙ্গে করমর্দনে আনন্দ পায়।

বাতির সামনে খামখানা নিয়ে গিয়ে বীরেনদা খাম খুললেন।

তারপর এক পাত্র জলের ওপর চিঠির কাগজখানা ফেলে দিয়ে বাতির সামনে মেলে ধরলেন।

কয়েকটি বিস্মিত মুহূর্তমাত্র তাকিয়ে ছিল সমর।

বীরেনদা ততক্ষণে পকেট থেকে একটি দেশলাইয়ের বাক্স বের করলেন। তারপর মুখের সামনে সেটি ধ'রে বিড় বিড় ক'রে কি যেন বললেন দু'এক মিনিট।

বাইরের বারন্দায় অনেকগুলি পায়ের জুতোর শব্দ হতেই বীরেনদা উঠে দাঁড়ালেন, সমর চমকে উঠলো।

অনুচ্চ কণ্ঠে হেসে বীরেনদা বললেন—ও কিছু নয় সমর, পুলিশ! ভয় কি! তুমি না বিপ্লবী!

ততক্ষণে কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ হ'ল—Hands up!

তীব্র টর্চের আলো মুখে চোখে সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়লো। বীরেনদা তার আগে কাগজটা তালগোল পাকিয়ে মুখে পুরেছেন। হাত তোলবার সঙ্গে সঙ্গেই পর পর কয়েকটি গুলির আওয়াজ হলো।

পুলিশ মর্গে দুটি মৃতদেহ পোষ্টমর্টেম করা হ'ল পরদিন সকালে।

বিপ্লবী বীরেনদার মুখ থেকে তালগোল পাকানো অয়েল পেপারখানা বেরুলো, আর জামার পকেট থেকে একটি ছোট্ট ট্রান্সমিটার যন্ত্র।

সরকারী গোয়েন্দারা অয়েল পেপারখানা ভিজিয়ে নিলে; তাতে নির্দেশ লেখা আছে···Transmit to blow up Govt. armoury at 1-40 sharp! Leader. অর্থাৎ ঠিক রাত্রি ১-৪০ মিনিটের সময় সরকারী অস্ত্রাগারে বিস্ফোরণ করার নির্দেশ পাঠাও! নেতা।

···হ্যালো! ব্যস্তভাবে পুলিশ কর্মচারী টেলিফোন তুলে

ধরলো। চাইলো অস্ত্রাগার ও বারুদখানার কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলতে, কিন্তু জবাব পেল না। ওপাশ থেকে অন্য টেলিফোন বেজে উঠলো। ছুটে গিয়ে ধরলো রিসিভার—

—হ্যালো!

—সরকারী বারুদখানা কাল রাত্রি ১-৪০ মিনিটের সময় বিপ্লবীরা বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে!